পঞ্চম অধ্যায়

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

চর্তুদশ শতকে যে মঙ্গলকাব্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল তা দীর্ঘ কয়েক'শ বছর পথ পরিক্রমের শেষে তার আদর্শ ও শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শক্তিহীন স্রোতে নতুন কাহিনী, দেব ভাবনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য এবং রীতি ঘটিত অভিনবত্ব আনয়নের মধ্যে দিয়ে জীর্ণ সাহিত্য ধারায় নব প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছিল শিবায়ন কাব্যে। দেখা গিয়েছিল এক সময় মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবপদ- সাহিত্য রচনার জোয়ারে ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। এই সময় কবিগণ মনসামঙ্গল কাব্যের সংকলন গ্রন্থ 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল', 'ষট্ কবির মনসামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। অবশ্য এখানে 'বাইশ' বা 'ষট্' শব্দগুলি বহুত্ব বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই বৈষ্ণবপদ-সংকলন গ্রন্থ রচনায় তাদের দায়িত্ব পালন করেন, যদিও পদাবলীর চর্চা ও সঙ্কীর্তন ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল এবং সেগুলি তাদের ধর্মচর্চার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। রচিত হয়েছিল 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'গীতচন্দ্রোদয়' 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি', পদামৃতসমুদ্র' 'পদকল্পতরু'ব মত গ্রন্থাবলী। এই রীতি প্রযুক্ত হবার ফলে বহু খ্যাত ও অখ্যাত কবির কাব্য কালগর্ভ থেকে রক্ষা পেয়েছে, বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচনা করি। পঞ্চদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি অপৌরাণিক দেবীমঙ্গলের স্থলে সপ্তদশ শতকে কতকগুলি পৌরাণিক দেবদেবী মঙ্গল রচিত হয়েছে; রচিত হয়েছে প্রচুর অপ্রধান দেবদেবীমঙ্গল। শিবঠাকুর অবশ্য পৌরাণিক ও অপৌরাণিক স্বরূপের মিশ্রিত রূপ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি কতকগুলি গতানুগতিক আদর্শকে অনুসরণ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেখানে শিবায়ন নতুন স্বাদ নিয়ে আসে। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য ধারা হিসাবে চিহ্নিত হলেও অনেকেই অবশ্য এই কাব্যটিকে আদর্শ মঙ্গলকাব্য বলতে রাজী নন, অবশ্য এবিষয়ে উভয় দিকে কিছু যুক্তি রয়েছে।

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য না বলার পেছনে যুক্তিগুলি হল—

প্রথমত ঃ মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত দেবদেবীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী শাপভ্রষ্ট দেবতা বা অপ্সর-অপ্সরীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে এবং পূজার প্রচারে তার মধ্যস্থতা গ্রহণ করে। শিবায়নে শিবঠাকুর কোন দেবতা বা অপ্সর-অপ্সরীকে শাপভ্রষ্ট করে মর্ত্যে প্রেরণ করেনি। এমন কি পূজা প্রচারে তার আগ্রহ দেখা যায় না; কারণ শিবঠাকুর পূর্ব থেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়ত ঃ মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী শিবায়নে সুস্পষ্ট দেবখণ্ড-নরখণ্ড বিভাজন নেই, শিবায়নের কাহিনী দেবখণ্ড হয়ে নরখণ্ডে প্রবেশ করেনি। এখানে মানবলোকের পৃথক কাহিনীও নেই।অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতারা যেখানে নরকল্প, সেখানে শিবঠাকুর অনেক বেশী মর্ত্য পৃথিবীর মানুষ।

তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা— নায়কের 'চৌতিশা স্তব', নায়িকার 'বারমাস্যা' বর্ণনা শিবায়নে নেই।

লক্ষণীয়, তা সত্ত্বেও শিবায়নকে মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। কারণ-

প্রথমতঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত পৌরাণিক ও অপৌরাণিক দেবভাবনার মিশ্রণে শিবঠাকুরের অবয়ব গঠিত।

দ্বিতীয়তঃ শিবায়নে বর্ণিত শিবকাহিনীগুলি অনূদিত কাহিনী নয়, বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত শিব সম্পর্কিত কাহিনীর সমবায়ে গঠিত।

তৃতীয়তঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই বাঙালীর সমাজজীবন, পরিবারজীবন অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম ছবি শিবায়নে ফুটে উঠেছে।

মঙ্গলকাব্য ধারায় শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বয়োঃকনিষ্ঠ শাখা হিসেবে বিবেচিত হলেও, লক্ষণীয় যে শিবঠাকুর সম্পর্কিত গীত প্রচারিত ছিল বহু প্রাচীনকালেই; সম্ভবত চৈতন্য-পূর্বযুগেই শিবঠাকুরের গীত প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে শিব সম্পর্কিত কথা পাওয়া যায়-

"একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়- গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্করমূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে 'মুঞি সে শঙ্কর'॥
কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত/১৩৯)

বাংলাদেশে শিবঠাকুরের প্রভাব বহু ব্যাপক, শিবঠাকুরকে তাই বাংলার 'জাতীয় দেবতা', বলে অভিহিত করা যায়'। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মূলত অনার্য-লৌকিক সমাজ থেকে আগত দেবতাসমূহের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, অথচ মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটা অংশ শিব কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুরকে কেউ কেউ শিবঠাকুরের সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছেন। বস্তুত ধর্মদেবের অবয়বে যে সমস্ত দেবতার প্রভাব আছে তার মধ্যে শিবঠাকুরের অংশই অধিক। নাথ সাহিত্যেও আমরা শিবঠাকুরের কথা পাই। লক্ষণীয় যে সমস্ত লৌকিক দেবকথা মঙ্গলকাব্যে আছে তারা প্রত্যেকেই শিবঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেই কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটাতে চেয়েছে। একদিক থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের প্রতিটিই শিবমঙ্গলও বটে, কারণ প্রত্যেকটিতেই শিব সংস্পর্শ আছে। এই শিবকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য শাখা গড়ে উঠেছে তাহাই শিবায়ন বা শিব মঙ্গলকাব্য।

শিবঠাকুরের স্বরূপঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে শিবঠাকুর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "ভারতীয় যে সকল প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান।"[২] পণ্ডিতগণের মতে শিবঠাকুর পুরাণ আশ্রিত দেব পরিকল্পনা হলেও বৈদিক দেবতা নয়। বাংলাদেশে শৈবধর্মের প্রচারে বহু আর্যেতর উপদান মিশ্রিত ছিল বলেই পণ্ডিতগণের অনুমান। অনার্য দেবতা শিবঠাকুর প্রাক্ আর্য দেবতা হলেও আর্য সমাজে সে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল; এদিক থেকে শিবঠাকুর ভারতের প্রাচীনতম দেবতা হিসাবেই চিহ্নিত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার আবিষ্কৃত শীলমোহরে শিবের পশুপতি মূর্তি পাওয়া গেছে। এমন কি লিঙ্গরূপী শিবঠাকুরের পরিকল্পনাও বহু প্রাচীন বলে অনুমিত হয়েছে। বৈদিক শিব রুদ্র; রূদ্র দেবতার মধ্যে বহু অনার্য উপকরণ আছে, বৈদিক সমাজে অনার্য দেবতা স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে এক শান্ত সমাহিত রূপ শিবঠাকুরের পরিকল্পনার পশ্চাতে কাজ করেছিল। কারো কারো মতে শিবঠাকুর দ্রাবিড় জাতির দেবতা। অনার্য

প্রতিবেশ থেকেই শিবঠাকুরের ছাই-ভস্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, সর্পালঙ্কার ভূষিত শিবঠাকুরের পরিকল্পনা। আবার পৌরাণিক শিবঠাকুরের উপর বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবও স্বীকৃত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে— "ব্রাহ্মণ্যধর্ম এ'দেশে প্রচার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বহু উপাদান আসিয়া লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধ সমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। জৈন তীর্থঙ্করদিগের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে, এইজন্যই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দ্বারা এ'দেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল।"[৩] ডঃ ভট্টাচার্য শিবঠাকুরের দরিদ্র ভিখারী পরিকল্পনার উপরে বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন। পৌরাণিক শিবঠাকুর রুদ্র বা ধ্বংসের দেবতা হলেও সে ভোলানাথ, এ কারণেই সম্ভবত সকল শ্রেণীর ও সকল ধর্মের মানুষ তাকে সহজে আপন করে নিতে পেরেছিল। পৌরাণিক শৈবধর্ম সমাজের নিম্নস্তরে প্রচার লাভ করে নতুন রূপলাভ করেছিল। বাংলায় শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য এই দেবতাটিকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। তবে শিবায়নে ও লৌকিক ছড়ায় যে শিবঠাকুরের কথা আমরা পাই, সে পৌরাণিক রুদ্রদেব নয়; সে স্বতন্ত্র শিব, লৌকিক শিবঠাকুর। সে বাংলার কোন এক পল্লীর শিব নামধারী গৃহস্থ মাত্র।সে বাংলার কৃষককুল থেকে উদ্ভূত কৃষক সমাজের দেবতা। বাংলায় প্রচলিত ছড়ায় বর্ণিত শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গটি নিম্নরূপ-

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান॥"[৪]

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"কোন কোন জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা, (Fertility god) বলিয়া পূজিত হন। ইনি কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে পরিকল্পিত হন।"[৫]

কোচ জাতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় বিভিন্ন শিবায়ন কাব্যে, কোচ কৃষক সমাজে লৌকিক শিবঠাকুরের উদ্ভব বলে অনুমিত হয়েছে। আবার 'শঙ্খপরা' পালায় শিবঠাকুরের শাঁখারীর ছদ্মবেশ দেখা যায়, সুতরাং শাঁখারী বৃত্তিভূক্ত জাতির সঙ্গে শিবঠাকুরের সম্পর্ক কল্পনা করা হয়েছে। লৌকিক শিবঠাকুরের বাহন বলদ। সে গাঁজা-ভাঙ্ বা সিদ্ধি সেবন করে থাকে—এ সমস্ত কাহিনী সম্ভবত লোকভাবনা জাত এবং লৌকিক জীবনের তথ্য সমৃদ্ধ, তার উপর পৌরাণিক প্রভাব নেই। হয়ত বা লৌকিক প্রভাবই পৌরাণিক শিবঠাকুরকে খানিকটা পরিবর্তিত করে থাকবে। বাংলার শিবঠাকুর গোলোকবিহারী দেবাদিদেব নয়, সে স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত জীবনের শত-সহস্র বন্ধন ও অভাব অভিযোগের মধ্যে বাংলার নিভৃত পল্লীতে গৃহী জীবনযাপন করে থাকে।

বাংলায় শিবঠাকুর সম্পর্কিত সাহিত্যে দু'টি কাহিনী প্রচলিত— (১) মৃগলুব্ধ কাহিনী এবং (২) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল। মৃগলুব্ধ মূলত শিবচতুর্দশী ব্রতের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য, অনেকটা ব্রতকথার ধাঁচের। অবশ্য শিবচতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে ব্রতীরা যে ব্রতকথা শুনে থাকে তা মৃগলুব্ধ কাহিনী। শিবচতুর্দশী ব্রত করে কিভাবে এক ব্যাধ স্বর্গে গমন করেছিল এবং রাজা মুচকুন্দ শিবচতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে সেই কাহিনী শুনে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিল, তার কাহিনীই এখানে উপজীব্য। মৃগলুব্ধ কাহিনীতে কোন লৌকিক দেবতার প্রাধান্যের কথা নেই। বাঙালী কবিগণ বিভিন্ন পুরাণ, বিশেষত মহাভারত, হরিবংশ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ মন্থন করে শিবমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। এই কাহিনীতে ব্যাধ কাহিনীর উপর গুরুত্ব দেওয়ায় অনুমান করা হয়েছে শিবঠাকুর ব্যাধ সমাজেরও দেবতা ছিল।

মৃগলুব্ধ কাহিনীতে কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রনে কোন বিশেষত্ব নেই. এমন কি মঙ্গলকাব্যের কোন লক্ষণও এতে নেই। কোন প্রতিভাবান কবির সাক্ষাৎ এই ধারায় পাওয়া যায়নি। মৃগলুব্ধ কাহিনীতে মূলত দু'জন প্রধান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এঁরা হলেন রামরাজা এবং রতিদেব। চট্টগ্রাম অঞ্চলে শৈবতীর্থগুলিকে কেন্দ্র করে শৈবধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল এবং মৃগলুব্ধ কাহিনী পুষ্টিলাভ করেছিল। পরবর্তীকালে সম্ভবত বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলামধর্মের ব্যাপক প্রচলন শৈবধর্মে ভাঁটার টান ধরায়। তাই মৃগলুব্ধ কাব্যগুলিতে শৈবধর্মের ভগ্নতার ছাপ আছে।

শিব সম্পর্কিত কাহিনী নিয়ে যে কাব্যধারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছিল তা শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শিবপার্বতী সম্পর্কিত কাহিনী আছে। তবে লক্ষণীয় যে প্রতিটি কাব্যে শিবঠাকুরের স্বরূপ কিন্তু এক নয়, মনসামঙ্গলের শিবঠাকুর স্খলিত চরিত্র ব্রাহ্মণ ও কামুক শিবঠাকুর; চণ্ডীমঙ্গল এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী, আর শিবায়নের শিবঠাকুর কৃষক। আবার ধর্মমঙ্গলে শিবঠাকুর বিভিন্ন প্রসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ধর্মদেবে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মূলত দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কোথাও দেবতার সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠা, কোথাও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের মধ্যে দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা, আবার কোথাও বা দুই পক্ষীয় মানুষের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দুই দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, কোন মঙ্গলকাব্যের দেবতা কখনো স্বয়ং নায়ক চরিত্ররূপে অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু শিবায়ন কাব্যে স্বয়ং শিবঠাকুরই কাব্যের নায়ক; অবশ্য সে পূজা প্রচার বা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি। শিবায়নে শিবঠাকুর দেবতা হলেও তার আচার - আচরণ সম্পূর্ণ মানবিক এবং কাব্যের মূল বিষয় শিবের দাম্পত্য জীবন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত শিবায়ন কাব্য দেব-মানব দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদিও শিবায়ন মঙ্গলকাব্যের সকল বৈশিষ্ট্যকে পূরণ করে না তবুও শিবায়ন কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাঙালী সমাজের একটা বিশেষ পর্বে দেবচরিত্র সম্পর্কে কবিগণের নতুন ভাবনা শিবায়ন কাব্যকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করে তুলেছে।

শিবায়ন কাব্যকাহিনী ও শিবচতুর্দশী ব্রতের কাহিনী স্বতন্ত্র। ব্রতের কাহিনীতে সংক্ষেপে মৃগলুব্ধ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য বাংলা লোকসাহিত্যে শিবঠাকুর সম্পর্কিত নানা কাহিনী এবং নানা ছড়া প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে শিবঠাকুর সম্পর্কিত বিভিন্ন ছড়ার উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় ছড়া যে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাই 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শিবকাহিনী ও ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে শিবের গাজন উপলক্ষে যে সমস্ত ছড়া উল্লেখ করা হয়েছে তাতে শিবের চাষবাস সম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—

"শিবে হাথে ত্রিশক ভাঁগ্যা গড়ান কোদালি ফাল।
দুর্গা বলে ইয়াকে চাই তিনটী গজাল॥
আনিয়া শালের মুড়া দিল ফুল চাঁচ।
দুর্গা বলে ইয়াকে চাই দ্রব্য চারি পাঁচ॥
আস জুড়ি পাশ জুড়ি চাই দুই ভীতা।
সুবর্ণের জুয়ালি চাই নাঞিখ অন্যথা॥
গোটা পাটা আদি আন্যা গড়িলেন মই।
ময়ের দুপাশে চাই ছান্দন দুগাছি দড়ি।
হ্যালা চালাইতে চায়ি সুবর্ণের লড়ি॥
সনার নাঙ্গল হল্য রূপার হল্য ফাল।

বাঘে বৃষে মহাপ্রভু জুড়িলেন হাল॥

... ...

প্রথম বৈশাখ মাসে দিলেন উগাল।
দ্বিতীয়াতে মহাপ্রভু করিল রসাল॥
তিন চাস দিয়া প্রভু দিলা তথি মই।
শুন শুন আগো দুর্গা তুমারে কই॥
ভূমি সাধ্য হল্য শুন হেমন্তের ঝি।
বিহন ধান্যের তরে করিব কি।

... ...

দ্বিতীয় জুগতে প্রভু চাস চসিল।
তৃতীয় যুগেতে প্রভু ধান্য পেলাইল॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে ভূমে বায়া দেখা দিল।
দেখিয়া শঙ্কর কৃশি হরসিত হল্য॥
আষাড় মাসেতে ধান্যে দিল মই দিয়া।
শ্রাবণ মাসেতে ধান্য দিল কাড়াইয়া॥
ভাদ্রপদ মাসে ধান্য করিল নিড়ান।
আশ্বিন মাসেতে জল বান্ধে সাবধান॥
বিষুব সংক্রান্তি পায়্যা ভকত বৎসল।
ধান্য ডাকিলেন প্রভু ক্ষেত্রে প্রতি নল॥
ফুলিয়া সকল ধান্য হল্য সমতুল।
ধান্য সব সঞ্চরিল মাথে করি ফুল॥ (শূন্যপুরাণ/২৩৬-২৩৯)

শিবায়ন কাব্যে শিবঠাকুরের ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙল-জোয়াল তৈরী ও চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। শিব সম্পর্কিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াতে শিবঠাকুরের চাষবাসের প্রসঙ্গ পাই। শিবায়ন কাব্যে গৌরীর 'শঙ্খপরা পালা' একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত শিবঠাকুর সম্পর্কিত ছড়াতে গৌরীর শঙ্খপরার কথা পাই। যেমন উত্তরবঙ্গ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি ছড়া—

"আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে নাগিবে ঝগড়া॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রণ-পরশুম তাকে।
হাতে শাঙ্কা নাই দ্যান গোঁসাই নজ্জা পাছু তাতে॥
শাঙ্কা কিনিয়া দ্যাও হে মদন মুরলী।
দশ হাতে দশ মুট শাঙ্কা কানে মদন কড়ি॥
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব॥
কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলকে পালিব।[৬]

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যের প্রবন্ধ গুচ্ছে 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে সংগৃহীত কিছু ছড়ায় গৌরীর শাঁখা পরার আকাঙ্ক্ষার কথা পাই। যেমন—

তোমার নারী হয়ে আমার সাধ নাহি পোরে।
যেন বেন্যা পতির কপালে পড়ে রমণী ঝোরে॥
দিব্য সোনার অলংকার না পরিলাম গায়।
শামের বরন দুই শঙ্খ পরতে সাধ যায়॥
দেবের কাছে মরি লাজে হাত বাড়াতে নারি।
বারেক মোরে দাও শঙ্খ, তোমার ঘরে পরি।[৭]

শাঁখা পরা নিয়ে শিবপার্বতী কলহ, পার্বতীর পিতৃগৃহে গমন এবং শেষ পর্যন্ত শিব শাঁখারী বেশ ধারণ করে পার্বতীকে শাঁখা পরায়। দেখা যাচ্ছে শিবায়নে বর্ণিত শিবঠাকুর সম্পর্কিত কাহিনী ছড়া আকারে জনসমাজে ছড়িয়ে ছিল এবং পরবর্তীকালে সম্ভবত কোন শক্তিমান কবির হাতে পড়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রূপ পরিগ্রহ করে।

শিবায়ন কাব্য কাহিনী ঃ মঙ্গলকাব্যের আদর্শকে বজায় রেখে শিবায়ন কাব্যে দুটি অংশ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড চিহ্নিত করা হয়েছে। দেবখণ্ডে আছে পৌরাণিক শিবঠাকুরের পৌরাণিক কাহিনী আর নরখণ্ডে আছে লৌকিক শিবের লৌকিক কাহিনী। দেবখণ্ডে আছে দক্ষের যজ্ঞ, পার্বতীর বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে গমন, দক্ষের শিব নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, মেনকার গর্ভে সতীর গৌরী রূপে জন্মগ্রহণ, শিবের ধ্যানভঙ্গ, মদনভস্ম, শিবপার্বতীর বিবাহ ইত্যাদি পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি। নরখণ্ডে আছে হরগৌরীর সংসারযাত্রা নির্বাহের কাহিনী। সংসারের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গৌরী শিবঠাকুরকে মর্ত্যে গিয়ে চাষবাসে মন দিতে বলল। শিবঠাকুর তখন ইন্দ্রের নিকট থেকে জমি গ্রহণ করল, ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে চাষের যন্ত্রপাতি লাঙল-জোয়াল তৈরী করাল, কুবেরের নিকট থেকে বীজ ধান গ্রহণ করে অনুচর তথা ভাগিনেয় ভীমের সহায়তায় চাষবাস আরম্ভ করল। এদিকে জমিতে ফসল ফললে শিবঠাকুর পৃথিবীর মায়ায় স্বর্গলোকের কথা একেবারে ভুলে গেল। আর কৈলাসে দেবী শিব অদর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেবী পৃথিবীতে ডাঁশ, মাছি, মশা প্রেরণ করল, শিবঠাকুর মশা ও মাছির কামড়ে অস্থির হয়ে পড়ল কিন্তু নরলোক থেকে ফিরে গেল না। তখন দেবী বাগদী নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে শিবঠাকুরের ক্ষেতে মাছ ধরতে লাগল। শিবঠাকুর বাগদিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। দেবী কৌশলে শিবঠাকুরের কাছ থেকে আংটি আদায় করল, যাই হোক পরে স্বর্গে শিব-পার্বতীর মিলন হল। শেষে শিবঠাকুর নিজের আংটি দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। এদিকে দেবী শিবঠাকুরের নিকট শাঁখা চাইলে শিবঠাকুর জানায়—

"ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥" (রামেশ্বর/২৮১)

সুতরাং পার্বতী মহাদেবের নিকট শাঁখা না পেয়ে পিতৃগৃহে চলে গেল, আর এদিকে শিবঠাকুর শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পার্বতীকে ছলনা করে এবং শেষ পর্যন্ত পার্বতীকে শাঁখা পরায়। এই ভাবে শিব-পার্বতীর মিলন ঘটল। শিবায়নে কাহিনী সম্পর্কিত কিছু বিশেষত্ব আছে, যেমন—

প্রথমতঃ শিবায়নের কাহিনীতে লৌকিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবমাহাত্ম্য প্রচার কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, এখানে জীবন ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই শিব সাধারণ কৃষক সমাজেরই প্রতিনিধি।

দ্বিতীয়তঃ শিব চরিত্রের দুর্বলতার কথা পাওয়া যায় পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে, কিন্তু সে তবুও দেবাদিদেব। শিবায়নে শিবঠাকুর কামুক, লম্পট ও নিন্দিত একটি চরিত্র। জনরুচি ও যুগরুচির তাগিদেই সম্ভবত কবি শিব চরিত্রকে এভাবে অঙ্কন করেছেন।

তৃতীয়তঃ শিবায়নে পল্লীবাংলার যে জীবনচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তা অনন্য। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত শিবঠাকুর অমঙ্গলকারী অপদেবতা নয়, দোষে-গুণে ভরা মানব চরিত্র। শিবায়নে আমরা মানব জীবনের স্বাদ পেয়ে থাকি।

শিবায়ন কাব্য ও কবিগণ ঃ অন্যান্য কাব্যের মত শিবায়ন কাব্যেরও অবশ্য আমরা প্রধান প্রধান কবিদের কথাই বলব। শিবায়ন কাব্য ধারার তিনজন কবির কাব্য পাওয়া যায়, এঁরা হলেন রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য। শিবায়ন কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

শিবায়ন কাব্যের অন্যতম কবি রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যই সম্ভবত সর্ববৃহৎ শিবায়ন কাব্য। কবি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবির পিতার নাম কৃষ্ণ রায়, মাতা রাধা দাসী; নিবাস-হাওড়া জেলার রসপুর গ্রাম। কবির আত্মপরিচয় অনুসারে—

"পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি॥
পিতামহী বন্দিলাঙ্ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ্ তাঁহার সতিনী॥
মাতামহ বন্দিলাম নাম সূর্যমিত্র।
তেয়জ কুলীন তিঁহো পবিত্র চরিত্র॥
পিতা কৃষ্ণরায় বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর।
যাহার প্রসাদে এই মনুষ্যশরীর॥
মাতা রাধা দাসীর চরণে দণ্ডবৎ।
যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ॥" (রামকৃষ্ণ/৭৮)

কবি কাব্যে রচনাকাল উল্লেখ করেননি। কাব্য সম্পাদক কবির পারিবারিক ইতিহাসের নানাবিধ তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাব্য রচনাকাল স্থির করেছেন। জানা যায় বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রসপুর আক্রমণ করে বলপূর্বক কবির সাতপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ নিয়ে যান, ফলে বৃদ্ধ কবি কুলবিগ্রহের শোকে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবত কবির বয়স তখন নব্বই বছর। কবি সম্ভবত ১৫৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের দু-এক বছর পর কাব্য রচনা করেন।[৮]

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্য স্থূলায়তন, কাব্যটি পালাভিত্তিক রচনা এবং সর্বমোট ছাব্বিশ (২৬)টি পালায় রচিত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যেরক্ষেত্রে পালাভিত্তিক রচনায় যে একটা নিয়ম ছিল এবং পালাগুলির মধ্যে দিয়ে একটা কাহিনী গড়ে উঠেছিল শিবায়ন কাব্যেরক্ষেত্রে সে রকম কিছু দেখা যায় না। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের গঠন আরও শিথিল। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে পালা রচনা কোন ঐতিহ্য অনুসৃত নয়; কবির স্বেচ্ছাকৃত ছাব্বিশটি পালায় কোন অনিবার্য কাহিনী সংযোগ নেই। কবি এখানে বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক শিবকাহিনী গ্রথিত করে স্থূলায়তন কাব্য রচনা করেছেন এবং প্রতিটি পালাই এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—"ইহা বিভিন্ন শিব-প্রসঙ্গের একটি সংকলন মাত্র— তবে এই সংকলনের পরিকল্পনায় শিবকাহিনীর পারম্পর্য যে রক্ষিত হয় নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না—কিছুদূর পর্যন্ত পুরাণানুযায়ী ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করিবার পর ইহাতে কিছু কিছু লৌকিক উপাদানও অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।"[৯] অতঃপর আমরা রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের কাহিনী পরিকল্পনাটি দেখি—

১ম পালায় — গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা ও সৃষ্টি বর্ণনা।

২য় পালা — শিবের জন্ম হতে শিবের বিবাহ বর্ণনা পর্যন্ত।

৩য় পালা — ব্রহ্মা-বিষ্ণু বিবাদ, কালভৈরব মাহাত্ম্য এবং শিবের কাশীমাহাত্ম্য ও শিবস্তুতি পর্যন্ত।

৪র্থ পালা — দক্ষযজ্ঞ থেকে দক্ষালয়ে সতী পর্যন্ত বর্ণনা।

৫ম পালা — দক্ষের শিব নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ থেকে শিবের আজ্ঞা ও গুণগান পর্যন্ত॥

৬ষ্ট পালা — ময়দানব তারকোপখ্যান, কালনেমির যুদ্ধ ও মৃত্যু, দেবাসুরের সান্ত্বনা ইত্যাদি।

৭ম পালা — হিমগিরির কথা, হিমালয় মেনকার বিবাহ, আদ্যার জন্ম ,মদনভস্ম, রতি বিলাপ, গৌরীর অভিমান ও তপস্যায় অনুমতি পর্যন্ত।

৮ম পালা — মেনকার নিষেধ, গৌরীর তপস্যা, শিবের পরীক্ষা থেকে কৈলাসে নারদ পর্যন্ত।

৯ম পালা — শিবের উদ্যানে গৌরীর পুষ্পচয়ন, হরগৌরীর মিলন ইত্যাদি।

১০ম পালা — হিমালয় গৃহে শিব থেকে নীলগিরির দৌত্য পর্যন্ত।

১১শ পালা — কুমারের জন্ম ও মহিষবধ।

১২শ পালা — শিবের বিবাহ থেকে ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ও বিবাহ পর্যন্ত।

১৩শ পালা — কুশণ্ডিকা থেকে ফুলশয্যা পর্যন্ত।

১৪শ পালা — ফুলশয্যায় গৌরী, প্রহেলিকা, শিবের যোগসাধন ও অগ্নিনির্বাণ পর্যন্ত।

১৫শ পালা — পাশাখেলা, শিবতত্ত্ব বর্ণনা, শিবের কৈলাসযাত্রা ইত্যাদি থেকে লিঙ্গপূজা পর্যন্ত।

১৬শ পালা — মনসার উপাখ্যান।

১৭শ পালা — সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান।

১৮শ পালা — বলিরাজার উপাখ্যান।

১৯তম পালা — অগস্ত্য ও সগর রাজার উপাখ্যান।

২০তম পালা — গঙ্গার উপাখ্যান।

২১তম পালা — ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান।

২২তম পালা — দুর্গার কন্দল।

২৩তম পালা — অন্ধক উপাখ্যান।

২৪ তম পালা — অন্ধকবধ উপাখ্যান।

২৫তম পালা — পরশুরাম ও রাবণ উপাখ্যান।

২৬তম পালা —বাণরাজার উপাখ্যান।

রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, যেমন—

প্রথমত ঃ রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে প্রথম কয়েকটি পালায় কাহিনীর যোগসূত্র রক্ষিত হলেও শেষ দিকে অদৌ সংগতি রক্ষিত হয়নি অর্থাৎ পরিপূর্ণ কাহিনী সৃজনের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। শিবের বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত পালায় (১২,১৩,১৪) বৈদিক ও লৌকিক লোকাচার পালিত হয়েছে, আবার 'মনসার উপখ্যান' (১৬পালা). 'দুর্গার কন্দল' (২২পালা) পালায় বিভিন্ন লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে শিব সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনী, যথা— শিবের চাষ, মৎস্যধরা. শঙ্খপরা ইত্যাদি কবি অদৌ গ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয়ত ঃ বিপুলায়তন কাব্য হলেও কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাবে কাব্যটি সমগ্রতা লাভ করেনি, তাছাড়া চরিত্র সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণের কোন প্রবণতা এখানে দেখা যায় না।

তৃতীয়ত ঃ লৌকিক শিবের চরিত্রে কবি প্রাধান্য না দিলেও শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কলহ, মনসার

উপাখ্যান অংশগুলিতে বাঙালীর লৌকিক গার্হস্থ্য চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ঃ শিবায়ন কাব্যের প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বর ভট্টাচার্য কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা পাঠে জানা যায়, কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী-

"ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশর-কণী
যতিচক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুইনারী
অযোধ্যানগর নিকেতন॥" (রামেশ্বর/ ১৮৮)

কবির বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম; হেমৎ সিংহ নামক কোন ব্যক্তির অত্যাচারে কবি শেষ পর্যন্ত কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যশোবন্ত সিংহ কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁরই আদেশে কবি কাব্য রচনা করেন। 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' ছাড়াও রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। কবি কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কাল নির্ণায়ক পয়ার দিয়েছেন তাঁর কাব্যে—

"শকে হৈল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল্য কোলে।
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল্য সারা
অবনীতে আল্য যেন অমৃতের ধারা॥ (ঐ/ ৩৫০)

এই শ্লোকগুলির অর্থ উদ্ধার করে কাল নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয়নি। রামেশ্বরের শিবায়ন প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় তাতে কাব্যের রচনাকাল হিসাবে ১৬৩৪ শকাব্দ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অনেকেই সেটা গ্রহণ করেননি। উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোমন্ত সিংহ কর্মত্যাগ করে মেদিনীপুরে ফিরে আসেন এবং অল্পকাল পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি রাজা হন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য যশোমন্ত সিংহের রাজসভায় সভাপণ্ডিতের কাজ পান এবং তারপর 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' কাব্য রচনা করেন। সুতরাং পণ্ডিতদের অনুমান ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে মোটামুটি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামেশ্বর কাব্য রচনা করেন।[১০] আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোমন্ত সিং দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বে মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে চাকুরী করতেন। ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন যশোমন্ত সিংহ দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বেই রামেশ্বর কাব্য রচনা করেন।[১১]

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যের প্রকৃত নাম 'শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা'; শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নয়। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের মত কাব্যটি পালাভিত্তিক রচনা এবং এতে মোট আটটি পালা আছে। তাঁর কাব্যদেহ নিম্নরূপ–

প্রথম পালা— (বন্দনা পালা) গ্রন্থের সূচনা, সূতের প্রতি প্রশ্ন, সূতের উত্তর দান, সৃষ্টি কালের দেবতা, সৃষ্টি বিবরণ, পৃথিবীর উৎপত্তি।

দ্বিতীয় পালা— দক্ষযজ্ঞ কথা, শিব-নারদ সংবাদ, দক্ষযজ্ঞে সতীর গমন-মানস, পতি নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষ সৈন্য ধ্বংস, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, দক্ষের ছাগ-মুণ্ড ধারণ।

তৃতীয় পালা— গৌরীর জন্মলাভ, রতি বিলাপ থেকে গৌরীর বিবাহে হিমালয়ের যৌতুক দান।

চতুর্থ পালা— শিবের শ্বশুর বাড়ীতে বাস, কোঁচনী পাড়ায় শিব, শিবের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে হরগৌরীর কলহ, হরিনাম মহিমা, যমদূত সংবাদ, শবরের বরলাভ ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

পঞ্চম পালা— রুক্মিণীহরণ কথা, রুক্মিণীর বিবাহ আয়োজন, বাণ রাজার কথা, হরিহরের যুদ্ধ, শিবের কৃষ্ণস্তব থেকে অনিরুদ্ধের বিবাহ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ পালা— বকাসুর কথা, হরগৌরী সংবাদ, শিবরাত্রি বিধি, ব্যাধের শিবপূজা, শিবরাত্রির ব্রত, চাষের বিবরণ থেকে শস্যোৎপত্তি পর্যন্ত।

সপ্তম পালা— নারদের কৈলাস গমন-উদ্যোগ, গৌরীকে মন্ত্রণা-দান, মশা-মাছি-ডাঁশ প্রেরণ, জোঁকের উৎপাত, বাগ্‌দিনী পালা আরম্ভ থেকে শিবের কৈলাস গমন পর্যন্ত।

অষ্টম পালা— (জাগরণ পালা) হরগৌরীর মিলন মন্ত্রণা, গৌরীর শঙ্খ-পরিধান কথা থেকে গীত সমাপন পর্যন্ত।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য পণ্ডিত কবি ছিলেন। কাব্যে কবি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য সাহিত্য এমন কি কালিদাসের কাব্যেরও ব্যবহার করেছেন। শিব সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করলেও অধিকাংশক্ষেত্রে লৌকিক কাহিনী এমন কি মৌলিক কল্পনা শক্তিরও ব্যবহার করেছেন। যে সমস্ত অংশে কবি লৌকিক শিব চরিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে দেবচরিত্র মহিমা বর্জিত হয়ে মানবিক মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

সমাজ বৃত্ত ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই শিবায়ন কাব্যে উল্লিখিত সমাজ ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি—

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ

খাদ্য ও পানীয় ঃ প্রথমে আসা যাক্ শিবায়ন কাব্যে উল্লিখিত বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য ও পানীয়। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করে শিবায়ন কাব্যে কবিগণ মধ্যযুগীয় বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় দিয়েছেন। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে দেবতা ও ঋষিগণের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে খাদ্য তালিকা পাওয়া যায়। জামাতা শিবঠাকুরকে মেনা রানী লেহ্য-পেয়-চোষ্য-চর্ব্য চার প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরিপাটি রন্ধন করে খাওয়ায় —

"লোকাচারে রন্ধন করিল মেনা রাণী।
ক্ষীর ভোজন তথা কৈল শূলপাণি॥
... ...
লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য এ চারি প্রকারে।" (রামকৃষ্ণ/১৩৭)

বাঙালীর প্রধান খাদ্য হল ভাত। তাইতো রামেশ্বর ভট্টাচার্য কন্যার জন্য হাঁটু ঢাকা বস্ত্র আর পেট ভরা ভাতের কামনা করেন—

"আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।" (রামেশ্বর/ ৫২)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে 'গৌরীর রন্ধন' অংশ কিংবা 'গৌরীর বিবাহ খেলা' অংশে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়ের উপযোগী, তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর সকল রকমের খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে। ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শাক, সুক্তা, সূপ, বড়ি ভাজা, বিভিন্ন ধরনের মাছ ইত্যাদির উল্লেখ পাই। 'গৌরীর বিবাহ খেলা' অংশে গৌরীর পুতুলবিয়ের ছলে বাঙালীর খাদ্যের কথা পাই। যেমন—

"সবাকার সম্মুখে পাতিয়া কচুপাত।
ধরণীর ধূলা তাতে আন্যা দিল ভাত॥
শাক দিল শাকমুরি সজিনার পাতা।
সূপ দিল তপ্তবালি ত্রিভুবন মাতা॥
বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।
কলামূলা ভাজা দিল কাট্যা কাঁটাসিজ॥
পুঁটি মৎস্য ভাজা দিল ভাল খোলা কুচি।
সফরীতে সবার সুন্দর হবে রুচি॥
বৃহৎ সুসিদ্ধ দিল রোহিতের মুড়া।
চিন্তিনি অম্বল দিল ঢেমনের চূড়া॥
পুকুরের পঙ্ক আন্যা দধি দিল টান্যা।
স্পর্শমাত্র কর্য়া মুখে সব দিল পেল্যা॥ (রামেশ্বর / ৫১)

এছাড়া ক্ষীর, দধি-দুগ্ধ, ছানা, বিভিন্ন প্রকার পিঠা, পায়েস, লাড্ডু বাঙালীর প্রিয় খাদ্য।রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যে গৌরীর বিবাহে 'ঋষিগণের নিমন্ত্রণ' অংশে পাই—

"কসেরু কর্কটি ফল ছেনা শর্করা জল
ক্ষীর খণ্ড পিষ্টক পায়স।
ঘৃত অন্ন থালা থালা শাক সূপ ভাজা তলা
ঝালে ঝোলে দিল ছয় রস॥" (রামকৃষ্ণ / ১৪০)

মিষ্টান্ন বাঙালীর অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, মঙ্গলকাব্যে তার বহুল উল্লেখ পাই। দরিদ্র শিবের সংসারেও পায়েসের কথা কবি ভোলেননি। যেমন—

"পায়স পর্য্যন্ত পূর প্রস্তুত সমস্ত॥
পায়স করিয়া আদি সূপ কর্য়া অন্ত।
রাজরাজেশ্বরী রামা রান্ধিল যাবন্ত॥" (রামেশ্বর / ১০৩)

বিভিন্ন প্রকার ফল বাঙালীর খাদ্য তালিকার অন্তর্গত; সাধারণ মানুষ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা ফলমূল খেত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের অন্নগ্রহণের পরিবর্তে ফলমূল ভক্ষণের কথা পাই—

"কেহ কেহ ব্রহ্মচারী সর্ব্বকাল ফলাহারী
রম্ভা নারিকেল ফলে প্রীত।
পনস রসাল বিল্ব কেহ পান করে তিল
কেহ কেহ পিএ পঞ্চামৃত॥" (রামকৃষ্ণ / ১৪০)

আহারান্তে পানের ব্যবহার বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে ধনীরা কর্পূর, কস্তুরী সহযোগে পান খেত।

সাধারণ মানুষের মধ্যেও পানের বহুল ব্যবহার হত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে ভোজনের শেষে-

"কর্পূর তাম্বুল কিছু করিল ভক্ষণ।
অঙ্গেতে কুঙ্কুম চুয়া কস্তুরী চন্দন॥ (ঐ/ ১৩৭)

রামেশ্বরের কাব্যে পার্বতীর পুতুলবিয়ের খাওয়া দাওয়ার শেষেও কবি পান দিতে ভোলেননি—

"পিপুলের পাতা আন্যা পান দিল পিছু।
পূর্ণ হইল পেট আর বাকি নাই কিছু॥" (রামেশ্বর / ৫২)

শিবায়ন কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের এক বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে; এ সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। হরগৌরীর সংসারযাত্রা অংশে বাঙালীর খাদ্যরীতির মধ্যে দিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরকন্নার চিত্র ফুটে উঠেছে।

আহারের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বাঙালীর খাদ্য তালিকায় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের উপযুক্ত সব রকম খাদ্যই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত হত এবং সেখানে তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর সব রকম স্বাদের খাদ্যের আয়োজন থাকত, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে তার উল্লেখ পাই—

"চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ব মধু চতুর্বিধ ব্যঞ্জনের গণ॥ (ঐ/ ১০৩)

এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর খাদ্য পরিবেশনগত বিশেষত্বটি বোঝা যায়। সাধারণত, প্রথমে 'তিক্ত' ব্যঞ্জন তারপরে 'কষায়' অর্থাৎ ঝাল-ঝোল ইত্যাদি, তারপর 'অম্ব' অর্থাৎ অম্ল বা টক ব্যঞ্জন এবং শেষে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হত এবং পান বা তাম্বুল ভক্ষণের মধ্যে দিয়ে আহার সম্পূর্ণ হত। বাঙালী সাধারণত পিঁড়ি পেতে বা আসন পেতে বসে আহার করত; উপকরণ হিসাবে থালা, বাটি, বারিপাত্র বা গেলাস ব্যবহার করা হত। বাঙালী গৃহিণী সাধারণত স্বামী-পুত্র এবং অতিথিকে আগে ভোজন করিয়ে তবে নিজে ভোজন করত। স্বামী-পুত্র, আত্মপরিজনকে খাইয়ে তার আনন্দ, তাতে তার ক্লান্তি- শ্রান্তি ছিল না। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে শিবের ভোজনে তাইতো মনে হয়। যেমন—

"যোত্র কর্যা (ক) পুত্র দুটী বসে দুই পাসে।
পার্ব্বতী পুরট-পীঠে পুরহর বৈসে॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটী হাতে গুটী গুটী যত দিতে পার॥
তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচ করিয়া হাসে॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়্যা খা॥" (ঐ / ১০৪)

বাঙালী সমাজে রন্ধনে এবং পরিবেশনে নারীরাই অংশ গ্রহণ করত। পরিবেশনও নারীরাই দক্ষতার সাথে পরিচালনা করত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে নিমন্ত্রিত মুনি-ঋষিগণকে নারীদেরই পরিবেশন করতে দেখা যায়–

"পরিবেশনকারী যতেক মুনির নারী
হাসিআ সভেই খায় পাক।" (রামকৃষ্ণ / ১৪১)

গৃহস্থালীর দ্রব্য ঃ অতঃপর আসা যাক, মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত বাঙালীর লৌকিকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কিছু গৃহস্থালী উপকরণের কথায়। শিবায়ন কাব্যেও বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালী জিনিসপত্রের কথা পাই, যথা— হাঁড়ি, কলসী, বাটি, পানপাত্র, বাটা, ডাবর ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালীর আহারকালে যে সমস্ত গৃহস্থালী উপকরণ লাগে সেগুলি হল— থালা, বাটি, পানপাত্র, পিঁড়ি ইত্যাদি। যেমন—

"কি কহিব ভোজনসজ্জের পরিপাটি।
কাঞ্চননির্ম্মিত থালা নানাজাতি বাটি॥
রত্নের পাদুকা পিঁড়ি পানপাত্র ঝারি।
অমৃতসদৃশ ভোজ্য সুবাসিত বারি॥" (ঐ / ১৩৭)

'ডাবর' সাধারণত আচমনের জন্য ব্যবহার করা হত—

"কনকডাবরে হর কৈল আচমন।" (ঐ)

হাঁড়ির উল্লেখ আছে শিবায়ন কাব্যে, যেমন—

"কেহ উর্দ্ধমুখে ধায় পেলাইআ হাঁড়ি।
শাশুড়ী ননদী যায় হাতে করি বাড়ি॥" (ঐ/ ১৩৮)

গৃহস্থালীর বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে প্রদীপ, ঝাঁটা, কুলা, ডালা ইত্যাদি গৃহস্থালীর অঙ্গ। শিবায়নে তার ব্যবহার পাই—

"তিন পাএ নাচে দেবী হাথে ঝাঁটা কুলা॥ (ঐ/ ১২৯)

জিনিসপত্র রাখার জন্য ডালা ব্যবহার হত—

"বস্ত্র অলঙ্কার সঙ্গে যোগাইল ডালা॥
অগৌর গুগ্‌গুল দিয়া জ্বালিল ধূপতি।
এক দীপে জ্বালিলেক সহস্রেক বাতি॥" (ঐ/ ১৩৩)

কিংবা— "দুদিকে দুদাসী লয়্যা ঔষধের ডালা।
বরের নিকটে রাখে বরণের মালা॥" (রামেশ্বর / ৮০)

এছাড়া শিবায়নে সাঁপুড়া বা কৌটো, সুপারি কাটার জাঁতি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যে আছে—

"সাঁপুড়া দর্পণ পিঁড়ি কাজল্লতা জাঁতি।
চাঁদোয়া পালঙ্ক তুলি কাঁচুলি কঙ্কতি॥" (রামকৃষ্ণ / ১২৬)

এ সমস্ত উপাদানগুলির সঙ্গে বাঙালীর মাঙ্গলিক যোগ আছে। এছাড়াও আছে চামর শঙ্খ, সিন্দুর, রজত, হেম ইত্যাদি, যা বাঙালীর ধর্মীয় জীবনের নানান লোকাচারে ব্যবহৃত হত।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে শিবের চাষবাস প্রসঙ্গে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপকরণের কথা

আছে। মূলত মধ্যযুগীয় অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, এবং মধ্যযুগীয় চাষবাস হত সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতিতে। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত কৃষিযন্ত্রগুলি হল— লাঙল, জোয়াল, ফাল, মই, নিরানি, কোদাল ইত্যাদি। শিবায়নে তার উল্লেখ পাই—

"বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।
লাঙ্গল-জোয়াল-ফাল করিল নির্ম্মাণ॥
হলধর পাশী মার‍্যা পুরাইল ফাল।
আড় চাল লাঙ্গলের যুড়্যা রাখে আল॥
বাটা দিল কোদালে জোয়ালে দিয়া সলি।
পুরস্কার পায়্যা বিশ্বকর্ম্মা গেল চলি॥" (রামেশ্বর/২২৮-২২৯)

কর্ষিত ভূমির মাটি সমান করার জন্য মই দেওয়া হত—

"মাঠ কর‍্যা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ॥
উচ নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।" (ঐ / ২৩৭)

এছাড়া বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতির উল্লখ আছে, যথা— কামারের শাল, সাঁড়াসি, হাতুড়ি, নেহাই, জাঁত, ফাল, দা, উখুন, পাশী ইত্যাদি। যেমন—

"শাল পাত্যা শূল ভাঙ্গ্যা সজ্জা কর বসি।
জোয়াল কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥
.....
সর্ব্ব হাতে সাঁড়াশীতে শূল দিল ধর‍্যা।
আটুঁ পাত্যা বৈসে বুড়া আড়ম্বর কর‍্যা॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দে তায়্যা তায়্যা ই বল্যা ডাকে উভরায়॥
দড়বড় দৃঢ় কর‍্যা দিলেন দ্বিগুণ।
ফোঁস ফোঁস করে জাঁতা ফুকরে আগুন॥
ত্রস্তে পুড়ি ন্যস্ত করে নেহাই উপর।
উদয় পর্ব্বতে যেন শোভে দিনকর॥
হাতি পারা হাতুড় হেলায়্যা তোলে হাত।
মহেশ ভাবিয়া মনে মারিল নির্ঘাত॥" (ঐ/২২৫)

বাঙালী সমাজে দুটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল ঢেঁকি এবং উদূখল বা 'ছাম'। ঢেঁকি এবং উদূখল ধান ভেনে চাল করার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র। মধ্যযুগে চাল তৈরী করার কাজে একমাত্র উপায় হল উদূখল ও ঢেঁকি। শিবায়নে তার সুন্দর ব্যবহার আছে— "যশোদা লইয়া কৃষ্ণে উদূখলে বান্ধে॥" (ঐ/২২৭)। প্রসঙ্গটি পৌরাণিক সন্দেহ নাই. কিন্তু উদূখলের ব্যবহার মধ্যযুগে ছিল। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হত ঢেঁকির। কবির বর্ণনায়—

"নারদের ঢেঁকি আন্যা ধান্য ভানে ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভাল মোর পুত॥
বাতাসে বাউলা ভূত উড়াইল তুষ।
যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যূষ। (ঐ/২৩৬)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ যদিও শিবায়ন যুদ্ধবর্ণনার কাব্য নয় তবুও মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি মেনে যুদ্ধবর্ণনা করা হয়েছে। শিবায়নে যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' পালার সম্পাদক যোগিলাল হালদার বলেছেন— "ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে কবি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের রাজপথ গ্রহণ করিয়াছেন।"[২] রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যের যুদ্ধবর্ণনা সম্পর্কেও একথা বলা যায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ বর্ণনায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করা হলেও রুক্মিণী হরণের পর রাজাগণের সহিত যাদবের যুদ্ধ, 'রুক্মির যুদ্ধ', বাণ রাজার সহিত যাদবদের যুদ্ধ, হরিহরের যুদ্ধ, মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ পৌরাণিক যুদ্ধবর্ণনা রীতিতে বর্ণিত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের যুদ্ধবর্ণনাও মহাকাব্যের যুদ্ধবর্ণনা রীতিতে হয়েছে। এখানে শেল, শূল, শিলী, টাঙ্গী, ডাবুষ, পট্টিশ, নারাচ, কুঠার, ঢাল, তলোয়ার, শর, বাণ, চক্র ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্রের কথা আছে। এগুলি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সময়কালের যুদ্ধ ইতিহাসের কথা নয়, তা সমকালের সমাজ ইতিহাসের সত্যকে বহন করে না।

সাজসজ্জা ঃ অতঃপর আসা যাক্ পোশাক-পরিচ্ছদের কথায়। বাঙালীর সাধারণ পোশাক হিসাবে পুরুষরা ধুতি ও নারীরা শাড়ী পরিধান করত। উৎসব অনুষ্ঠানে শৌখিন শাড়ী ও ভাল পোশাক পরিধান করত। রামেশ্বরের কাব্যে গৌরীর বিবাহে নারীদের বেশভূষার কথা আছে—

"সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পর্য্যা।
দাণ্ডাল্য দেবের আগে দিব্য শোভা কর্য্যা॥" (ঐ/৮০)

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে শিবের বিবাহের তত্ত্ব হিসাবে পাঠানো হয়েছে কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ। কবির বর্ণনায়—

"কেন্দুয়া বাঘের ছাল গুজরাট ছিট॥
কৃষ্ণসারচর্ম্ম যেন পাটনেত শাড়ি।
মুনিপত্নীগণের দেখিব কাড়াকাড়ি॥" (রামকৃষ্ণ/১২৪)

পুরুষরা ধুতি ও লাঙট ব্যবহার করত, নারীগণ বক্ষাবরণ কাঁচুলি ব্যবহার করত। যেমন গৌরীর বাসরসজ্জা অংশে পাই—

"বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর।" (রামেশ্বর/৪৮)

সাধু-সন্ন্যাসীরা এবং পুরুষরা অন্তর্বাস হিসাবে কৌপীন ব্যবহার করত। যেমন—

"করে দিল করঙ্গ কৌপীন কটিদেশে।" (ঐ/১২৩)

শৌখিন বস্ত্র হিসাবে মেখলা, উত্তরীয়, ঘাঘরা ইত্যাদি বিভিন্ন বয়সের নারীরা ব্যবহার করত। ঘাঘর বা ঘাঘরার ব্যবহারও দেখা যায়—

"কটিদেশে কিঙ্কিণী করিছে কলরব।
ঘাঘরের উপরে ঘটার ঘটা সব॥ (ঐ/৪৮)

শয্যা নির্মাণে ব্যবহার করা হত খাট, বালিশ, মশারি, চাঁদোয়া, পাছড়া (সম্ভবত চাদর) ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর ফুলশয্যা বর্ণনায় শয্যা নির্মাণ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"তবে মহেশ্বর আসি বসিলা খট্টায়।
পাটের পাছড়া কথুবার তুলি তায়॥
আশে পাশে বালিশ পাটের মশাঅরি।
বিচিত্র চাঁদোআ শোভা করে তদুপরি॥" (রামকৃষ্ণ/১৪১-১৪২)

উৎসব বা বিবাহ উপলক্ষে গন্ধদ্রব্য, চন্দন, ফুল দিয়ে শয্যা নির্মাণের কথা পাই। যেমন—

"যক্ষকর্দ্দম গন্ধ লৈল ভরি শিশি॥

পথে ঝাটি দিয়া দিয়া চন্দনের ছড়া।
ফুল বিছাইয়া পাড়ে পাটের পাছড়া॥" (ঐ/১৪৪)

চামর, ব্যজন বা পাখা শয্যা নির্মাণের উপকরণ; গ্রীষ্মকালে চামর ও পাখা বাতাস করার জন্য ব্যবহৃত হত— "চামর ব্যজন করি পাদ সম্বাহন"॥(ঐ)

অথবা— "পাখা পরিত্যাগ করি তারার বচনে।
বসিলা আসিয়া গৌরী পদ সম্বাহণে॥" (ঐ/১৪৬)

তাছাড়া কম্বল ও ছাতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণের কথা পাওয়া যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরে আসি অলঙ্কারের কথায়; মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাঙালীর অলঙ্কার শিল্পের ক্যাটালগ। শিবায়ন কাব্যেও বাঙালী ব্যবহৃত বিভিন্ন অলঙ্কারের কথা পাই, যেমন— হার, কঙ্কণ, কেয়ূর, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয় বা আংটি, নূপুর, শঙ্খ, বলয়, পাসুলি, বউলি, পলা, চুড়ি, তার, মল ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে 'গৌরীর প্রসাধন' অংশে পাই—

"কর্ণেতে তাড়ঙ্ক দিল চক্র কলস।
গণ্ডে চিত্রকেল দিআ মৃগমদরস।
কণ্ঠ ভূষণিআ পাত নানাজাতি হার।
কাঁচলি বান্ধিল বুকে লেপি ঘনসার
শঙ্খ কঙ্কণ মুদ্রা বলয় কেয়ূর।
কটিতে মেখলা কাঞ্চী চরণে নূপুর॥" (ঐ/১৪২)

গৌরীর বর দর্শনে আগত নারীগণের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ রায় যে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে নানা অলঙ্কারের পরিচয় আছে। কবির বর্ণনানুসারে—

"পত্রাবলী মাঝে পরে কর্ণের কর্ণিকা।.
দিলেন উত্তর কাণে নাকের বেশর।
কনক বউলি নাকে না রহে সোঁশর॥
কেহ এক নয়নেতে পরিআ কজ্জল।
কেহ কেহ এক কাণে পড়িল কুণ্ডল॥
পাএর মঞ্জীর কেহ করিল অঙ্গদ॥
কেয়ূর বলয়া দিয়া সাজাইল পদ॥
হস্তের অঙ্গুলে দিল পাএর পাশুলি।
কটির কিঙ্কিণী কেহ গলে দেই তুলি॥ (ঐ/১৩৮)

সোনা ও রূপার বিভিন্ন গহনা নানা রকম মূল্যবান পাথর সহযোগে তৈরী হত । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে কিশোরী গৌরীর সাজসজ্জার বিবরণে তার সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন—

"গিরীন্দ্র গৌরীর গায় দিল অলঙ্কার॥
পায় দিল পাটামল পাসুলির পাঁতি।
মহামণি মুকুতা মণ্ডিত কত ভাতি॥
গুল্ফের উপর যে গঠিত গোটা মল।
দপদপ করে দুটী চরণ কমল॥
... ...

কন্ঠদেশে কত রত্ন শোভা করে হার।
মণির মোহন মালা মূল্য নাহি যার॥
সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি।
সূর্য্য রহিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি॥
রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে।
হাটক জড়িত হীরা দপ্ দপ্ জ্বলে॥
আগে সাজে পঁউছি পশ্চাতে বাজুবন্দ।
দিব্যরূপা পাটখোপা দেখিতে সুছন্দ॥
সকল অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরী ভূষিত।
মরকত চূণী মণি মাণিক্য ভূষিত॥
দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুই দর্পণের ছাব।
রবিশশী উভএ করাছে আবির্ভাব॥
বাহুমাঝে তাড় সাজে বিরাজে পদ্মিনী।
বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে বিশ্ব বিমোহিনী॥
নব ঢাকি উপরে বউলি বিলক্ষণ।
রতনে জড়িত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
দুদিকে দুগুণ মুক্তা মধ্যখানে চুণী।
সুবর্ণের নথ নাকে ভুবনমোহিনী। (রামেশ্বর/৪৮-৪৯)

শিবায়নে বাঙালীর রূপচর্চার কথা পাওয়া যায়। তেল, আমলকি, হরিদ্রা, চন্দন, কাজল, আলতা, কুঙ্কুম, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি রূপচর্চার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া রূপচর্চার সহায়ক উপকরণ দর্পণ, চিরুণী ইত্যাদি ব্যবহারের কথা পাই। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর প্রসাধন অংশের বর্ণনায় আছে—

"এথাতে পার্ব্বতী লৈআ যতেক অবলা।
উদ্বর্ত্তন করি তাঁর দূর কৈল মলা॥
চন্দন কস্তুরী চুয়া মিশাইয়া কুঙ্কুমে।
মঙ্গল করিল অঙ্গে এই চতুঃসমে॥
গন্ধরাজ তৈল দিআ কৈল অভ্যঙ্গিত।
কলসে আনিলা জল কর্পূরবাসিত॥
নখী আমলকী মিথি মাখিয়া মস্তকে।
স্নান করাইল সভে পরম কৌতুকে॥
... ...
কনককঙ্কতি লৈআ আঁচড়ে চিকুর।
সম্মুখেতে পদ্মাবতী ধরিল মুকুর॥" (রামকৃষ্ণ/১৪২)

নারীরা ললাটে চন্দন, কপালে সিন্দুর ও চোখে কাজল পরত। যেমন—

"ললাটে চন্দনবিন্দু সিন্দুরতিলক।
বিজুলী সদৃশ পত্রাবলীর ঝলক॥
চক্ষে পরাইল তাঁর সোহাগ অঞ্জন।

শরদ পঙ্কজে যেন উড়িছে খঞ্জন॥" (ঐ)

কিংবা, "সুন্দর কপালে দিল চন্দনের বিন্দু।
তার সনে তারাগণে আগুলিল ইন্দু॥
কজ্জলে উজ্জ্বল কর‍্যা কুরঙ্গ লোচন।
অপাঙ্গে অনঙ্গ বাণ করে বরিষণ॥" (রামেশ্বর/৪৯)

শাঁখা ও সিন্দুর হিন্দু বাঙালী এয়োস্ত্রীদের প্রধান প্রসাধন। শুধু প্রসাধনই নয়, এর সংস্কারগত মূল্যও আছে, তাইতো এয়োস্ত্রীদের আজন্ম সিন্দুর পড়ার আশীর্বাদ করা হত। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারীরা নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলতে নানা ছাঁদে চুল বাঁধত, খোপা, বিনুনী বা বেণী বাঁধত, বিভিন্ন রকম অলঙ্কার ও ফুল দ্বারা তারা সাজত, এতে তাঁদের রুচিবোধ এবং শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর প্রসাধন অংশে পাই—

"বেশ বিন্যাস সভে করে মনোসুখে।
অন্ধকারে আলো করে পার্ব্বতীর মুখে॥
বেণী বিনাঞা পিঠে পেলিল তাঁহার।
মণি উগারিয়া যেন ফণী করে চার॥" (রামকৃষ্ণ/১৪২)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে গৌরীর কেশ সজ্জার বিবরণে আছে—

"চিরাণিতে চিরিয়া চিকুর কৈল বন্ধ।
মদন মূর্চ্ছিত হৈল দেখিয়া সুছন্দ॥" (রামেশ্বর/৩১৯)

কিংবা— "খোঁপা বান্ধে চাঁপা ঝাঁপার সহিত।
মোহন-মল্লিকা মালা মস্তকে বেষ্টিত॥" (ঐ/৩৩৮)

শিবায়ন কাব্যে মধ্যযুগীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ বিন্যাসের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিত্তবানরা মূল্যবান পোশাক, গহনা ও অলঙ্কার দিয়ে সাজসজ্জা করত আর দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দারিদ্র্যময়। দরিদ্র সাধারণ নিম্নশ্রেণীর বাগদী, দুলে জাতির মানুষরা সাধারণ বস্ত্র, পিতলের ঝুটা গয়না পরিধান করত, খোপায় ফুল ব্যবহার করত। রামেশ্বরের গৌরীর বাগদিনী বেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে এই তথ্য পাওয়া যায়। কবির বর্ণনায়—

"দুহাতে দুগাছি মাঠ্যা কাপড় পড়েছে আঁট্যা
খাট কর‍্যা হাঁটুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটী
পুঁতি বেড়্যা সাজ্যাছে সুন্দর॥
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি খঞ্জন-গঞ্জন দেখি
সুললিত নাকে নাকচোনা।
নবীন নীরদ তনু তরুণ তিমির ভানু
রূপে আলো কৈল কাল্যাসোনা।
ভুবনমোহন খোঁপা সঙ্গী শালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়্যা পর‍্যাছে সিন্দুর।

কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়্যাছে উচ্চ

কদম্ব কুসুম কর্ণপুর॥

পিত্তলের ঝুট্যা পায় যাবক রঞ্জিত তায়

করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।" (ঐ/৩৪০)

বাদ্যযন্ত্র ঃ শিবায়ন কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উপকরণ হল বাদ্যযন্ত্র। ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, চামড়া আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, তারের বাদ্যযন্ত্র এবং বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাদ্যযন্ত্র— চার প্রকার বাদ্যযন্ত্র ই এখানে আছে, যেমন— দুন্দুভি, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল, ঢাক, ঢোল, দগ (দগড়),ডঙ্কা, ধামা (দামামা), ভেরী, মুরচঙ্গ, মুরারী, সপ্তস্বরা, পাখাজু, টমক, ঘণ্টা, সানি, রবার, কাঁসি, শঙ্খ, ভৃঙ্গা, বাঁশি, পিণাক, কবিলাস, খমক, মাদল, পড়া, কাড়া, ডিণ্ডিম ইত্যাদি।

বাঙালী আনন্দ-উৎসব, যথা— বিবাহ, পূজা-পার্বণাদি বা সন্তানের জন্মের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মহোৎসব করত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে 'ঋষিগণের আনন্দোৎসব' অংশে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্রের কথা পাই। যেমন—

"বাজে বাদ্য বীণা বেণু বেড়াজাল কাঁসি।
শঙ্খ সিংহনাদ ভৃঙ্গা করতাল বাঁশি॥
রবাব পিণাক স্বরমণ্ডল কেঙ্গিরা।
ঘণ্টার টঙ্কার ঘন বাজায় মন্দিরা॥
সপ্তস্বরা কবিলাস মধুর কেঙ্গারি
মাদল মৃদঙ্গ পড়া দণ্ডি মহুরি॥
তুম্বুরি কিন্নরী বাজে দগর টমক।
দামা দড়মশা ডম্ফ ডমরু খমক॥
ভেরী ভুড়ুঙ্গ সানি বাজে কাতকালি।
বিজি ঘোষ বিশাল ডিণ্ডিম একতালি॥
ঢাক ঢোল ঢেমচায় হৈল গণ্ডগোল।
শুনিতে না পায় তথা কেহ কার বোল॥(রামকৃষ্ণ /১২৭)

বিবাহ উপলক্ষে শুধু বাজনাই বাজত না রীতিমত নৃত্যগীতের আয়োজন হত—

"রথের সাজনী দেখি বাজনিঞা ধায়।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে সালিবেনু গায়॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী রম্ভা মেনকা অপ্সরা।
অঙ্গভঙ্গে নাচিআ বাজায় সপ্তস্বরা॥
পাখাজু মৃদঙ্গ বীণা কার কার হাতে।
করতাল মন্দিরা বাজাইআ যায় পথে॥ (ঐ /১৩৭)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে 'শিবের বরযাত্রা' অংশে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—

"ত্রিদশ দুন্দুভি বাজে বাজায় বিশাল।
বেণু বিনা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥

ঢাক ঢোল দগ ডঙ্কা সড় ধামা ভেরী।
মঙ্গল মুরচঙ্গ কত মোহন মুরারী॥
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গান করে তারা।
আগে আগে নৃত্য করে ইন্দ্রের অপ্সরা॥" (রামেশ্বর /৭৪)

এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির কতকগুলি যুদ্ধ যাত্রাকালে ব্যবহৃত হত, যথা— রণভেরী রণদামামা, শিঙ্গা, দগড়, কাড়া, রুদ্রবীণা জয়ঢাক ইত্যাদি। শিবায়নে যুদ্ধবর্ণনার অবকাশ কম, তাই এই বাদ্যযন্ত্রগুলি রণবাদ্যের অন্তর্গত করা হয়নি। বাদ্যযন্ত্র ছাড়া বিবাহ বা মঙ্গল উৎসবে বাজী পোড়ানো হত,যেমন-চরকি, হাউই বা হাওয়াই, আতস বাজী ইত্যাদির উল্লেখ আছে শিবায়নে। উজ্বল আলোর জন্য মশাল ব্যবহার হত। রামেশ্বরের বর্ণনায়—

"খোশাল হৈয়া পেতি মশাল যোগায়।
কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায়॥
দপ্ দপ্ দীপক জ্বলিছে ধুনা মড়া।
হাজার হাজার চলে হয়ে হাতী ঘোড়া॥
চরকি হইয়া কেহ চলে সাথে সাথে।
হাওয়াই হইয়া কেহ ধায় শূন্য পথে॥
অশেষ আতস বাজি করে সর্ব্বভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভেলা মোর পুত॥" (ঐ/৭৫)

শিল্পকর্ম ঃ শিবায়ন কাব্যে বাঙালীর ব্যবহৃত নানা উপকরণের মধ্যে দিয়ে নানা শিল্পকর্মে রুচি, শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় আছে। যেমন— দেবীর কাঁচুলি নির্মাণ মঙ্গলকাব্যের বিশেষ প্রসঙ্গ, এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগীয় বাঙালীর চিত্রশিল্পের পরিচয় পাই। সে সময়ে মেয়েরা যে কাঁচুলি বা বক্ষবন্ধনী ব্যবহার করত তাতে চমৎকার কারুকার্য থকত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"বিচিত্র বসনে বেশ চতুর্দ্দশ পুরী।
পূর্ব্বাপরে শোভা করে উদয়াস্ত গিরি॥
সোম সূর্য্য উভয় উদয় হয় তায়।
তার মাঝে বিরাজে তারকা সমুদায়॥
... ...
বিচিত্র কাঁচলি চিত্র করিয়া কামিলা।
বন্দনা করিয়া মাথে বিশ্বনাথে দিলা॥" (ঐ / ৩৩৫-৩৩৬)

শুধু কাঁচুলিই নয় শিবায়নে গৌরীর শঙ্খ নির্মাণের কথা আছে। কাঁচুলির মতই শঙ্খও নানা কারুকার্য মণ্ডিত করা হত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য শঙ্খের কারুকার্য বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় আছে। কবি লিখেছেন—

"যোগেন্দ্রপুরুষ যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি।
দিব্য দুটী বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি॥
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন কৈল তায়।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায়॥
... ...
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণিবার নয়।

সোম সূর্য্য সহিত সকল রত্নময়॥" (ঐ/ ৩০২-৩০৪)

তাছাড়া অলঙ্কার শিল্প বাংলার একটি বিশিষ্ট শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছিল। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা হত, সুন্দরভাবে পূজামণ্ডপ, বিবাহের ছায়ামণ্ডপ, পালঙ্ক ফুল-পাতা দিয়ে সুসজ্জিত করা হত।

যানবাহন ঃ অতঃপর আসা যাক্ যানবাহনের বাহনের কথায়। শিবায়নে সেকালে ব্যবহৃত যানবাহনসমূহের উল্লেখ করা হয়নি। তবে সাধারণত পশুর পিঠে যাতায়াত করা হত। তাছাড়া রথ বা ঘোড়ায় টানা গাড়ী, চতুর্দোল, পালকী ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিবায়ন কাব্যে সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানগুলি তেমনভাবে বর্ণনা করা হয়নি। কাব্য ইতিহাস নয়, তবে কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাসের নানান উপকরণ কাব্যে উঠে এসেছে। শিবায়নের কাব্যকাহিনী অনুসারে সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানের বর্ণনার অবকাশ নেই। যে জাতীয় কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কার বিশ্বাসগুলি উঠে এসেছিল শিবায়নে তার সুযোগ নেই। ঝাঁড়-ফুঁক, তুক্-তাক্, ঔষধীকরণ, বশীকরণ, গ্রহ-নক্ষত্র বিচার, পশুপাখির নানা নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয়ের কথাও নেই। এমন কি গণৎকার জ্যোতিষী, ওঝা ও বৈদ্যদের প্রভাবের কথাও নেই, অথচ এই সময়ে রচিত মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে তার প্রচুর বর্ণনা দেখা যায়। আমরা দেখেছি চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যান অংশে সংস্কার-বিশ্বাস, আচার আচরণগত লৌকিক উপাদানগুলির ব্যবহার কম। মনে হয় সহজ সরল নিম্নবর্ণের অনার্য সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কারগুলি তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি। কবিগণ অনেক সময় আপন সমাজের প্রসঙ্গকে ব্যাধ সমাজের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। শিবায়ন কাব্যে সাধারণ অশিক্ষিত কৃষিজীবী সমাজের কথা বর্ণিত হওয়ায় এই জাতীয় উপাদানের ব্যবহার অনেক কম। তবে কিছু উপাদান বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে, যেমন— শাঁখা ও সিন্দুর বাঙালী নারীর কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই শঙ্খের গুণাগুণ বিষয়ে সংস্কার ছিল—

"শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ তিলেক নাহি হয়॥
কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া॥ (ঐ/৩১১)

রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। এই সময় সমাজের বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল; কৃষিজীবী সমাজের মূল ধর্মই ছিল বৈষ্ণবধর্ম। বস্তুতপক্ষে শাক্ত এবং শৈবধর্ম হয়ে পড়েছিল উচ্চবিত্তের তথা উচ্চবর্ণের ধর্ম। লৌকিক সমাজে বিভিন্ন বার-ব্রত, শিব চতুর্দশীর ব্রত, একাদশী ব্রত, সত্যনারায়ণের ব্রত বা সত্যপীরের ব্রত প্রচলিত ছিল। শিবরাত্রি ব্রত মাহাত্ম্য, একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য প্রচলিত ছিল এবং তার প্রতি সাধারণ মানুষের এক জাতীয় বিশ্বাস কাজ করেছিল। শৈব-শাক্ত, বৈষ্ণব সকলের কাছেই একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য প্রচারিত ছিল। লোকে বিশ্বাস করত বলেই কবি প্রচার করেছেন—

"যোড় হাতে যত্ন কর‍্যা বলি জনে জনে।
খায়্য না খায়্য না অন্ন একাদশী দিনে॥
সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত।
একাদশী দিনে অন্ন খাবা অনুচিত।" (ঐ/২১৪)

শিবরাত্রি ব্রত সম্পর্কে অনুরূপ প্রচার ছিল—

"মোর চতুর্দ্দশী যেন অষ্টমী তোমার
একাদশী তেমন বিষ্ণুর ব্রত সার।

হরি হর হৈমবতী তিনে নাই ভেদ।
তিন ব্রত সভার কর্ত্তব্য বলে বেদ॥
শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।
মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ঠ হবে কিসে॥
একাদশী অন্ন খাল্যে অধঃপাত হয়।
অতএব সবার কর্ত্তব্য ব্রত হয়॥" (ঐ/ ২১১)

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে সংস্কার-বিশ্বাসের কথা নেই, কারণ কবি চৈতন্য প্রভাবিত মুক্ত সমাজে বৈদিক আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। শিবায়ন কাব্য প্রকৃতপক্ষে এক সমন্বয় যুগের ফসল; তাই এতে ধর্ম সমন্বয়ের কথা আছে, আছে অনেকটা আচার-বিচারহীন মুক্ত সমাজের কথা। যে সমাজের মূল কথা হল নব মানবতাবাদ। শিবায়নে আমরা এই নব মানবতাবাদের কথা পাই। তাই শিবঠাকুর স্বীয় পূজা প্রচারের চেষ্টা করেনি, ফসল ফলিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের সমাজে তুক্-তাক, ঔষধীকরণ বশীকরণের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তাই স্বীয় কন্যার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে কনের মাতা বিবাহকালে জামাতা বশীকরণের জন্য ঔষধ করত। শিবায়নে গৌরীর বিবাহে মেনকাকে চালপড়া ছোঁয়াতে দেখি—

"ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।
একে একে আরম্ভিল ঔষধের গণ॥
মন্ত্র পড়্যা গুড়ে চাউলি বক্ষে দিলে ফেল্যা।
দপ্ দপ্ কপালে দহন উঠে জ্বল্যা॥ (ঐ/৮১)

নারী সম্পর্কে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ ও সংস্কার প্রচলিত ছিল। রজঃস্বলা হবার পূর্বেই নারীকে পাত্রস্থ করা প্রয়োজন হত, না হলে তার পিতৃপুরুষগণের নরকবাস হয় এরূপ ধারণা ছিল—

"অবস্থিতা কালে যদি হয় রজস্বলা
তার পিতৃলোক ভুঞ্জে নরকের জ্বালা॥ (রামকৃষ্ণ/১১১)

শুধু তাই নয়, কন্যা যদি বিবাহের পূর্বে কোন পুরুষকে দেখে কামাসক্ত হয় কিংবা কোন পুরুষের প্রতি কটাক্ষ করে তবে তার কন্যার পিতা অধোগতি প্রাপ্ত হয় বলে মনে করা হত। যেমন—

"পুরুষ সম্ভাষে কন্যা হয় কামচিত্তা।
অবস্থিতা দোষেতে পাতকী হয় পিতা॥
অবস্থিতা কালে কন্যা পুরুষের প্রতি।
কটাক্ষে চাহিলে পিতা যায় অধোগতি॥" (ঐ)

পার্বতী স্বয়ং এই সমস্ত সামাজিক সংস্কার-বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারেনি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সতীত্বের মহিমা উৎকটভাবে প্রচলিত ছিল। সতী নারীর মহিমা সম্পর্কে রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন—

"গৌরী বলে সতী অগ্ন্যে নাহি যায় পোড়া।
তার গায়ে অগ্নি যেন চন্দনের ছড়া॥" (ঐ/১২১)

সতীত্বের মূল্য বাঙালী সমাজে কত দৃঢ় ছিল রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যেও তা দেখতে পাই—

"সতীর প্রতাপ সয়্যা শুন মন দিয়া।
জনম সার্থক হবে জুড়াইবে হিয়া॥

শুষ্ক হয় সাগর সতীর অভিশাপে।
সতী নষ্ট করিলে রাখিবে কার বাপে॥
সতীশাপে ঈশ্বর আপনি হল্যা অশ্ম।
সতীশাপে সুবর্ণের লঙ্কাপুরী ভস্ম॥
সতীর প্রতাপে কুরুবংশ হয় ক্ষয়।
সতীশাপে অনন্ত অবনী শিরে বয়॥
সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম।
ব্রহ্মাবিষ্ণু কহেন সতীর পরাক্রম॥ (রামেশ্বর / ৩১৩)

পরনারী সম্পর্কিত সংস্কার ছিল, পরনারী গমন সামাজিক দৃষ্টিতে পাপ বলে চিহ্নিত হত—

"পরস্ত্রীর প্রতি যদি মতি করে অন্য।
অধোগতি যায় অধমের অগ্রগণ্য॥ (ঐ)

বস্তুত এসময়ে সমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞদের প্রভাব অনেকটাই বোধ হয় হ্রাস পেয়েছিল। তাই এসময়ে রচিত মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাদের প্রভাবের কথা থাকলেও তা গতানুগতিক কাহিনীকে বজায় রাখার জন্য, এসময়ের মৌলিক কাব্য শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলে তার উল্লেখ নেই। বিশেষত অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র ব্যাস এবং শিবকে নিয়ে যে তামাশা করেছেন তাতে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সমাজে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষীদের এতকালের প্রভাব কিছুটা বজায় ছিলই। বিবাহ বা কোন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দৈবজ্ঞের পরামর্শে পাঁজি-পুথি দেখে, লগ্ন, তিথি, রাশি দেখে দিনক্ষণ স্থির করা হত। শিবায়নে গৌরীর বিবাহে দেবগণ তুলা লগ্নে শঙ্করের বিবাহ স্থির করে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়-

"তুলা লগ্নে হয় যেন শঙ্করের বিভা।" (ঐ/১২৩)

এছাড়া আশীর্বাদ, অভিশাপ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং তার ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস ছিল। গৌরীর বিবাহকালে তাকে সারাজীবন এয়ো থাকার আশীর্বাদ করা হয়েছিল—

"আশীর্ব্বাদ নিল কন্যা থাকিব আইয়াতে॥
আমিষ ভোজনে তাঁর যাইবেক কাল।
সিন্দূরে উজ্জ্বল তাঁর থাকিবেক ভাল॥
... ...
আশীর্ব্বাদ করে তথা যতেক আভীরী।
দুধে পূতে জন্মে জন্মে বাড়িবেন গৌরী॥ (ঐ/১৩০)

বাঙালী সমাজ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে, অলৌকিকতা নিয়ে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল।

শিবায়ন কাব্যে বাঙালীর আচার-বিচারগত ঐতিহ্যের কথা আছে। নবজাতকের জন্ম থেকে বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত পালিত আচারের কথা পাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। শিবায়নের কাহিনী অংশে জন্ম ও মৃত্যুকালীন আচারের কথা তেমন নেই তবে বিবাহাচারের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। রামেশ্বরের কাব্যে গৌরীর জন্মকালীন লোকাচার পালনের কথা আছে। বাঙালী সমাজে অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা সন্তানের জন্মকালে নানা রকম আমোদ-প্রমোদ করত। যেমন. গৌরীর জন্মকালে—

"লইয়া বান্ধব জনে বাদ্যগীত কোলাহলে
করিল কৌলিক মহোৎসব। (রামেশ্বর/৪৭)

কুলাচার অনুসারে নবজাতকের জন্মের পর নানান আচার পালিত হত, শিবায়ন কাব্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রসূতির গর্ভকালীন সময় থেকেই নানান লোকাচার পালিত হত,আবার সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে আঁতুরঘর বা সূতিকা গৃহে রাখা হত। যেমন–

"পূর্ণ গর্ভ হইলা মেনার লোকাচারে।
প্রসব হইলা রাণী সূতিকা আগারে॥"(রামকৃষ্ণ/৭২)

নবজাতকের জন্মকালে শঙ্খ, ঘন্টা বাদ্য ও উলুধ্বনি সহকারে নবজাতককে বরণ করে নেওয়া হত। ধাত্রী নবজাতকের নাড়িচ্ছেদ করত। তারপর কুলধর্ম অনুসারে ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা করা হত—

"শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজিল আকাশে।
জয় জয় হুলাহুলি কুসুম বরিষে॥
হীরার ধারাতে তাঁর কৈল নাভিচ্ছেদ।
স্নান করাইল কন্যা উচ্চারিল বেদ॥
হরিষে হেমন্ত ঋষি করিল জাতকর্ম্ম।
কন্যার জনমে যেন আছে কুলধর্ম্ম॥
ছয় রাত্রে ষষ্ঠীপূজা করাইল ঋষি।
রক্ষক বেড়িয়া জাগে যত দাস দাসী॥ (ঐ)

সাত মাসে নবজাতকের অন্নস্পর্শন বা অন্নপ্রাশন করা হত। এ উপলক্ষে মঙ্গলকর্ম, হোম যজ্ঞ করা হত। ধনীরা এই উপলক্ষে দানধ্যান করত, কেউ বা মঙ্গলগানের আয়োজন করত—

"সপ্ত মাসে তথাতে আইলা সপ্ত ঋষি।
হাহা হুহু সঙ্গে আইলা মেনকা উর্ব্বশী॥
মেনকা অপ্সরা রাজমহিষীর সই।
মঙ্গল গাইয়া সে বিলায় দই খই॥
নৃত্য গীত মহোৎসব বিবিধ বাজনা।
আইলা তথায় দেবঋষির অঙ্গনা॥
হোমকর্ম্ম সমাপিয়া কন্যার প্রাশন।
দেবপুরোহিত কৈল নামকরণ।" (ঐ)

অর্থাৎ অন্নপ্রাশনে নবজাতকের নামকরণও করে নেওয়া হত। রামেশ্বরের কাব্যে পাই পাঁচ মাস বয়সে কন্যার কর্ণভেদ করার কথা এবং সাত মাসে অন্নপ্রাশন ও নামকরণ করার কথা—

"পর্ব্বত পুণ্যাহ পাইয়া পাঁচ মাস কালে।
কর্ণভেদ কন্যার করে কুতূহলে॥
পুষ্যায় পরমানন্দে পরিপাটি করি।
সাতমাসে শিশুকে ওদন দিল গিরি॥ (রামেশ্বর/৪৭)

যৌবনকালে বিবাহ মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। শিবায়নে বাঙালীর বিবাহরীতির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৈদিক ও লোকাচার উভয়ে মিলেই বাঙালীর বিবাহাচার পালিত হত। গৃহস্থের ধর্মে কন্যার পাণিগ্রহণ সামাজিক রীতি। বিবাহের পূর্বে ঘটক মহাশয় বর-কনে নির্বাচন করে তিথি-নক্ষত্র বিচার করে বিবাহ লগ্ন স্থির করত। বাঙালীর বিবাহে ঘটকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কারণ—

"নন্দি বলে প্রভু বিভা নহে কভু
ঘটক না থাকে যথা।" (রামকৃষ্ণ /১০৪)

বাঙালীর বিবাহে নানা আচার ক্রমান্বয়ে পালিত হত. যথা— গায়েহলুদ-অধিবাস-জলসওয়া-বর বরণ–শুভদৃষ্টি-সম্প্রদান-সিন্দুর দান–কুশণ্ডিকা–বাসরযাপন–ফুলশয্যা ইত্যাদি। বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের প্রথম আচার হল গায়েহলুদ; বর ও কনেকে নিজ নিজ পারিবারিক আচার অনুসারে গায়ে হলুদ করানো হত। কবি লিখেছেন—

"বাদ্যগীত বিস্তর করিয়া কোলাহল।
হর্ষযুক্ত হৈয়া কৈল হরিদ্রা মঙ্গল॥"(রামেশ্বর/৭৩)

এরপর বর ও কনেকে নিজ গৃহে কুলাচার অনুসারে অধিবাস করানো হত এবং বর-কনের হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হত। যেমন—

"করিল আধিবাস মনেতে উল্লাস
দেবপুরোহিত জীব॥
করেতে মণিবন্ধে মঙ্গলসূতা বান্ধে
আসিয়া ভৃগু হরষিতে।" (রামকৃষ্ণ/১২২)

অধিবাসের উপকরণ হল—

"মহীগন্ধ শিলা ধান্য দুর্ব্বা পুষ্প ফল।
ঘৃত দধি দুগ্ধ দিল সিন্দূর কজ্জ্বল॥
রোচণা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রূপা তাম্র আদি।
চামর দর্পণ দীপ দিল যথাবিধি॥" (রামেশ্বর/৭৭)

ষোড়শমাতৃকাপূজা, ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়পূজা করে অধিবাস সম্পন্ন হত এবং পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে 'নান্দীমুখ' করা হত। কবির বর্ণনায়—

"বন্দিল প্রশস্ত পাত্র সূত্র বান্ধি করে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে তারপরে॥
ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজ্যা দিল বসুধারা।
চেদিরাজ পূজ্যা নান্দীমুখ কৈল সারা॥ (ঐ)

অন্যদিকে বরকেও যথাবিধি অধিবাস করানো হত। অবশ্য বিবাহ সম্পর্কিত আচার পালনে. অঞ্চল বিশেষে পার্থক্য আছে, কোথাও বা বরের অধিবাসের পর অধিবাসদ্রব্য এবং এয়োগণের নানা উপঢৌকন কন্যাগৃহে পাঠানো হত, তারপর কন্যার অধিবাস সম্পন্ন হত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে পাই শিবের অধিবাসের পর অধিবাস দ্রব্য হিমালয় গৃহে পাঠানো হয়েছে—

"অধিবাস দ্রব্য লও করি পরিপাটি।
যেমতে গৌরীর মাতা না করে আখুটি॥
কুবের ভাণ্ডারী হৈয়া চল সেই স্থানে।
সেই দ্রব্য দিবে তুমি যে চাহিব যখনে॥" (রামকৃষ্ণ /১২৩)

এই অনুষ্ঠানে প্রথমে পুকুর কেটে তার চার কোণে কলা. পান, সুপারি দেওয়া হত. এয়োগণ গন্ধদ্রব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায় নানা তীর্থের জলে মিশিয়ে পাত্র বা কন্যাকে স্নান করাত। যেমন—

"আকাটি পুকুরী কৈল চারি কোণে কলা।
আসন তাহার মধ্যে রাখিলেন শিলা॥

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল দিয়া হুলাহুলী।
গন্ধদ্রব্যে পার্ব্বতীর উদ্বর্ত্তন করি॥
পঞ্চামৃত পঞ্চ গব্য পঞ্চরত্ন জলে।
পঞ্চ কষায়ের রস দিল কুতূহলে॥
সর্ব্বতীর্থজলেতে গুলিয়া সর্ব্বৌষধি।
সহস্র ধারায় স্নান যেন আছে বিধি॥" (ঐ/১২৬)

এর পরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অধিবাস করানো হত এবং শেষে এয়োগণ বর বা কনের হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেত—

"অধিবাস হইল দুর্গা গেল অন্তঃপুরে।
অরুন্ধতী আগে যায় ধরি তাঁর করে॥" (ঐ/১২৭)

তারপর জলসওয়া নামক অনুষ্ঠান; এয়োস্ত্রীগণ মঙ্গলডালা, মঙ্গলঘট নিয়ে বাদ্য সহযোগে মঙ্গলগান গাইতে গাইতে জলসইতে যেত। রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন—

"হাতে কৈল মঙ্গলের ডালা।
জয় জয় যায় মেনা জল সহিবারে।
আইয় সুইয় শতে শতে চলিলা নগরপথে
মঙ্গল গাইয়া উচ্চস্বরে।" (ঐ/১২৮)

জলসইতে যাবার উপকরণ হল মঙ্গল ডালা, মঙ্গল ঘট, ফুল, পান, সুপারি, চন্দন, সিন্দুর, প্রদীপ, চামর, গঙ্গাজল ইত্যাদি। আসলে ঐ সমস্ত মাঙ্গলিক উপকরণ সহযোগে বিবাহমঙ্গল উপলক্ষে দেবদেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হত এবং তাদের আশীর্বাদ কামনা করা হত। নগরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যেখানে যত দেবদেবী আছে তাদের আহ্বান করা হত—

"পুনর্ব্বার আইলা রাণী নগর ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমিলা মুনির ঘরে ঘরে॥
কুটুম্বিনী সহিত করিয়া কুলাচার।
চৌহাটে করিল জাত গ্রামদেবতার॥" (ঐ/ ১৩০)

এবং শেষে জলপূর্ণ মঙ্গলঘট ছায়ামণ্ডপের বেদীকায় রাখা হত—

"ছায়ামণ্ডপেতে আছে কাঞ্চনবেদিকা।
তাহাতে মঙ্গলঘট রাখিল মেনকা॥" (ঐ /১৩২)

এদিকে বরযাত্রী সহ বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হলে কনের মাতা এবং এয়োরা বরকে পাদ্য, আসন, মধুপর্ক দিয়ে বর বরণ করে নিত। কবির বর্ণনায়—

"দিলেন আসন পাদ্য বরণের কালে।
অর্ঘ্য দিয়া আচমন দিল গঙ্গাজলে॥
মধুপর্ক পূরি দিল কাঞ্চনের পাত্র।
পরশিয়া শঙ্কর লইল ঘ্রাণ মাত্র॥" (ঐ/১৩৩)

এবং

"মেনা সাজাইয়া ডালা বরণ করিতে গেলা
আইয় সুইয়গণের সহিতে।" (ঐ)

বিবাহ উপলক্ষে ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হত, চার কোণে চারটি কলাগাছ পুঁতে ছায়ামণ্ডপ মঙ্গলঘট দিয়ে সুসজ্জিত করা হত। সেখানে বিবাহের স্ত্রীআচার পালিত হত। বরকে বিবাহ সভায় বা ছায়ামণ্ডপে এনে বিবাহাচার অনুসারে বরকে নানা রকম দ্রব্য উপহার দেওয়া হত এবং পরে কন্যাকে ছায়ামণ্ডপে নিয়ে আসা হত। কনে পান দিয়ে মুখ ঢেকে কন্যা সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করত এবং তারপর পান ফেলে দিয়ে বরকনের শুভদৃষ্টি ও মালাবদল করা হত। শেষে ছায়ামণ্ডপে বসিয়ে বরের হাতে কনের হাত বন্ধন করে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদান সম্পন্ন হত—

মধ্যে চন্দ্র আচ্ছাদন দিআ সাত বার।
প্রদক্ষিণ করি কন্যা হৈল নমস্কার॥
পান ঘুরাইআ আনএ ঔষধের ডালা।
চারি চক্ষে চাহিআ বদন কৈল মালা॥
অন্তস্পট দূর করি আনিল ছামনি।
কন্যা বর একত্র করিল দুই পাণি॥ (ঐ / ১৩৫)

এবং এরপর—

"তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল ত্রিপত্র তুলসীদল
আরম্ভ করিল মহাবাক্য॥
হর পার্ব্বতীর পাণি ঘটের উপর আনি
দিল পঞ্চ হরিতকী ফল॥
দুই হস্ত রাখি চিত্রে বেষ্টিত করিল সূত্রে
কন্যার হস্তেতে দিল জল॥
মুখচন্দ্রিকার লক্ষ্যে শুভদৃষ্টি চারি চক্ষে
বর কন্যা আচ্ছাদিআ বাসে।
দক্ষিণান্ত কৈল গিরি কন্যা সমর্পণ করি
বসাইল শিবের বাম পাশে॥" (ঐ/ ১৩৫)

বিবাহান্তে কন্যাকে সিঁদুর দান করা হত —

"শঙ্কর আপন হাথে সিন্দুর দিলেন সিঁথে
পরশিল কর কর্ণশোভা।" (ঐ / ১৩৬)

পরদিন বাসিবিয়ে ; এর প্রধান আচার হল কুশণ্ডিকা বা হোম বা যজ্ঞক্রিয়া। কৃত্রিম পুকুর নির্মাণ করে বর-কনেকে স্নান করানো হত এবং তারপরে হোমাগ্নি সাক্ষী করে নেবার জন্য কুশণ্ডিকা বা যজ্ঞক্রিয়াসাধন করা হত—

"কৃত্রিম পুকুরি করি আনি কন্যা বরে।
স্নান করাইল সভে গৌরী মহেশ্বরে॥
কুশণ্ডিকা ক্রিয়া সাঙ্গ কৈল সপ্ত ঋষি॥" (ঐ / ১৩৬)

বিবাহান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়-পরিজনদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হত। সকলেই নবদম্পতিকে নানা যৌতুক প্রদান করে আশীর্বাদ করত। তারপর কনের মাতা লোকাচার মত রন্ধন করে নব জামাতাকে আহার

করাত। সেদিন রাত্রে দম্পতির বাসরযাপন করা হয়। কনের মাতা নানা উপদেশ দিয়ে কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে। পতিগৃহে নব দম্পতির প্রথম অনুষ্ঠান হল ফুলশয্যা, সেই রাত্রেই ফুলশয্যায় নববধূ এবং বরের মধ্যে কিছু প্রহেলিকার উত্তর প্রত্যুত্তর হত। এর মধ্যে দিয়ে নব দম্পতির সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে যেত। পরদিন প্রাতে এয়োগণ নবদম্পতির নিকট থেকে শয্যা তোলা বাবদ নানান উপহার আদায় করত—

"পুষ্পশয্যা হইল বাসি কে আছে তোমার দাসী
বাসি শেজি তোলে বিনা দানে।
এক এক পাট শাড়ি পঞ্চাশ কাহন কড়ি
যদি দিতে পার প্রতি জনে॥" (ঐ / ১৪৯)

বাঙালীর বিবাহে নানা সংস্কার পালন করা হত , যেমন–বিধবা, অপুত্রক, অলক্ষ্মীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই মেনকা জলসইবার সময় পাপ অলক্ষ্মীকে সঙ্গে যেতে নিষেধ করে—

"অরুন্ধতী বলে তুমি অপসর দূরে।
তোমার আসিতে বিধি নহে দেবপুরে॥
... ...
দূরে হইতে দেখ যদি থাকে অভিলাষ।" (ঐ / ১২৯-১৩০)

মানব জীবনে মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু কিছু আচার পালিত হত তবে শিবায়নে মৃত্যু সম্পর্কিত কোন আচারের বর্ণনা নেই। সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে সহমরণের দাপট যে খুব সাধারণ জনসমাজে ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে। শিবায়নে সহমরণের কথা পাওয়া যায় 'রতি-বিলাপ' অংশে। সহমরণে গমনের সময় সদ্য বিধবা স্ত্রী আমের ডাল হাতে মৃত স্বামীর শিয়রে বসত, তাকে সিন্দুর, চন্দন, কাজল দিয়ে সাজানো হত এবং নানা রকম মিষ্টান্ন, পান ও কর্পূর খাওয়ানো হত। উপস্থিত সকলে জয়-জোকার, শঙ্খধ্বনি করে সতীর আশীর্বাদ কামনা করত। তাই কবি বলেন—

"প্রবেশিব পাবকে প্রভুর পদলোভে।
কুণ্ড জ্বাল কুণ্ড জ্বাল হরি বল সবে॥
আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বৈসে সতী।
... ...
মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেই মিঠা।
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খণ্ড পিঠা॥
সিন্দূর কজ্জ্বল দিয়া বসন ভূষণ।
কতজনে করে পাখা চামর ব্যজন॥
কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।
কর্পূর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা॥
বাদ্য গীত হুলাহুলি দিয়া জয় জয়।
নতি হইয়া সতীর আশিস্ সবে লয়॥
স্নান দান তর্পণ করিয়া গঙ্গা জলে।
চিকুরে চিরুণী সব সিন্দূর কপালে॥ (রামেশ্বর/৬১-৬২)

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি ভাব-কেন্দ্রিক উপকরণগুলি অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতির কথায়।

শিবঠাকুর শিবায়নে কৃষিজীবী সমাজের দেবতা, সুতরাং শিবায়ন কাব্য গড়ে উঠেছে নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী সমাজকে আশ্রয় করে। ফলে শিবঠাকুর, গৌরীঠাকুরানী, ভৃত্য ভীম, কার্তিক, গণেশ প্রত্যেকেই সাধারণ জনসমাজের মানুষ ; তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা খুব একটা ছিল না। শিবায়নে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ও সেভাবে অনুপস্থিত। তবে বিবাহ বা পালাপার্বণে, মণ্ডপসজ্জা, পালঙ্ক সজ্জায় রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় আছে। শঙ্খের কারুকার্য, কাঁচুলি চিত্রনে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের পরিচয় আছে। বাঙালী সংস্কৃতির একটি বড় দিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ; শিবায়নে শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা আছে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে হিমালয় গৃহে দুর্গোৎসবের সুন্দর বিবরণ আছে। যেমন কবির বিবরণ অনুসারে—

"শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।
নৃত্য গীত আনন্দিত সকল নগরে॥" (ঐ/ ৩০০)

বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মঙ্গলগীত গাওয়া হত, এগুলি অবশ্যই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির বিষয়।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিবায়নের একটি অন্যতম বিষয় প্রবাদ-প্রচনের ব্যবহার। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে পড়ে ছড়া, পাঁচালী, ধাঁধাঁ প্রবাদ-প্রবচন। শিবায়নে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার দেখতে পাই। কবি সমাজ অভিজ্ঞতারভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার করেছেন কাব্যে। যেমন, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদসমূহ—

১। স্ত্রী জাতি যত দেখ ঐশ্বর্য্যের বশ।
২। পোড়া ঘায়ে পড়ে যেন লবণের ছিটা।
৩। গন্ধবাস নাহি পায় শিমুলের ফুলে।
৪। সাগর শুখাল্য মা গ কপালের দোষে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদসমূহ—

১। পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে।
২। দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাহি আর।
৩। বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী।
৪। পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
৫। নামের নিমিত্ত লোকে নানা কর্ম্ম করে।
৬। হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।

প্রবাদগুলির মধ্যে দিয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ন্যায়-নৈতিকতা, সমাজ, অর্থনীতি ও মানব চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। প্রবাদ-প্রবচন ছাড়াও প্রচুর বিশিষ্ট বাক্‌রীতির ব্যবহার দেখা যায় এখানে। শিবায়ন কাব্যে প্রচুর ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে, যেগুলি বিবাহ সভায়, বাসরযাপনে বা ফুলশয্যার সময় বর নব বধূকে জিজ্ঞাসা করত। এর মধ্যে বাঙালীর জীবন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ আছে, যা বাইরের রূপগতভাবে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হলেও আভ্যন্তরীণ গঠনে পরিবর্তন হয়নি। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন কাব্যে হরগৌরীর বিবাহকালে ঋষি পত্নীগণ বাসরঘরে শিবকে কয়েকটি ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা করেছে। ধাঁধাঁটি হল—

"যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন॥
নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রী জাতি।
শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি॥

হর, বুঝ প্রহেলিকা হর বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে একপাটলা বালিকা॥" (রামকৃষ্ণ /১৪৬-১৪৭)

এর সমাধান 'নারিকেল'। লক্ষণীয় বিষয় শিবঠাকুর এই ধাঁধাঁগুলির উত্তর সরাসরি না দিয়ে প্রহেলিকার মধ্যে দিয়েই দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এর মধ্যে দিয়ে চরিত্রের বৈদগ্ধ ও রসবোধের পরিচয় প্রকাশিত। যেমন প্রত্যুত্তরে কথিত ধাঁধাঁটি হল ——

"শুন একপাটলা তোমার প্রহেলিকা।
নাম কহিআ দিলে দিবে কুমুদকলিকা॥
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ইকারান্ত।
সেই ত বৃক্ষের ফল শুন গ সুন্দরী।
শুনি কহি ইবে একপর্ণার হেয়ালি॥" (ঐ/১৪৮)

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপদানগুলির কথা শিবায়ন কাব্যে কিছু পাওয়া যায়। বাঙালী ঘরের বালিকারা বাল্যকালে অন্য ক্রীড়া অপেক্ষা পুতুলবিয়ে খেলত। এর মধ্যে দিয়ে বাল্যকাল থেকেই তাদের মনে ঘরকন্না, স্বামী ও সংসার সম্পর্কে ধারণা জন্মাত।গৌরীর বাল্যক্রীড়া বর্ণনা করতে গিয়ে রামেশ্বর সেকালের কতকগুলি লোকক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন। ক্রীড়ার বর্ণনা এরকম–

"খেলে লুকলুকানি (ক) আপনি হয়্যা বুড়ি।
একচোরে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি॥
.....
খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়া লয়্যা কড়ি।
দাম ধর্ম্ম ফেলে দান ফেলে বুড়ি বুড়ি॥
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে।
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিয়া হরে॥
মিছা মুঠা কর্য়া কার গুণাগার কর্য়া।
করে কর ধর্য়া কিল মারে শ্বাস ধর্য়া॥
দুই চাইর সখীসহ হয়্যা সমবায়।
খেল্যা ফুল ঘুসিংহ পুখুর দিল তায়॥
আঁটুল বাটুল খেলে পসারিয়া পা।
আর কত লীলা খেলা কত কব তা॥" (রামেশ্বর/৫৩-৫৪)

পাশা খেলার কথা শিবায়নে পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার প্রবণতা বোধহয় মধ্যযুগীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না, কাব্যে তার ব্যবহারও নেই। যুগগত অস্থিরতা এবং দৈন্যতার মধ্যে সাধারণ জনজীবনে শরীরচর্চা করা খুব একটা সম্ভব ছিল না বলেই মনে হয়।

সমাজিক অবস্থা ঃ রামকৃষ্ণ রায় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রায় এক'শ বছর পূর্বে কাব্য রচনা করেছিলেন সুতরাং রামকৃষ্ণ রায়ের কাল ছিল মঙ্গলকাব্য রচনার ঐশ্বর্য যুগ। এই যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। চৈতন্যদেবের ভাব ও প্রেমসাধনার বন্যা বাংলার আকাশ বাতাসকে একদা প্লাবিত করেছিল তার প্রভাব অনেকাংশে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল, ফলে সমাজে নৈতিক পরিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তা বজায় ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর তাঁর সমুন্নত আদর্শ সমাজ থেকে যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই সমাজ চরিত্রে

নৈতিক শিথিলতা প্রকাশিত হতে লাগল। রামকৃষ্ণের কাব্য রচনার এক'শ বছরের ব্যবধানে সমাজ চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, ফলে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে সমাজের নীতিভ্রষ্ট কদর্য রুচি বড় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়ে ভারতচন্দ্রের যুগে এসে পৌঁছায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যেও ভ্রষ্ট সমাজ চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ যুগ পরিবেশেই রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্য রচিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রায়ের কিছু পূর্বে মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন ; মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে যে সমুন্নত মহিমা, আদর্শ ও রুচিবোধের প্রকাশ আছে রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যও ঐরকম একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগেই রচিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রায় তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; যুগরুচি বা যুগগত প্রভাব তাঁর কাব্যদেহকে তাই স্পর্শ করতে পারেনি। রামকৃষ্ণ রায় প্রধানত বিভিন্ন পুরাণের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়কে সংযোজিত করে শিবায়ন কাব্য রচনা করেছিলেন, সেখানে তিনি শিব সম্পর্কিত লৌকিক কাহিনীকে গুরুত্ব দেননি। বস্তুতপক্ষে চৈতন্য প্রভাবিত সমাজের আদর্শে পৌরাণিক মূল্যবোধের স্বপ্নে তিনি শিব চরিত্রকে গড়ে তুলেছিলেন, ফলে তাঁর শিব চরিত্রটি যথার্থ মানব চরিত্র হয়ে যুগ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "রামকৃষ্ণ শিব-সম্পর্কিত সর্বাধিক জনপ্রিয় ও লৌকিক প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্য হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জ্ঞানলব্ধ ও রুচিসম্মত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছেন।"[৩০] একারণে রামকৃষ্ণের শিবায়নে যুগচিত্র ও সমাজ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রগুলি ফুটে উঠতে পারেনি। মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে সমুন্নত আদর্শ অবলম্বন করলেও যুগগত প্রবণতাগুলিকে অস্বীকার করতে পারেননি। রামকৃষ্ণ রায় যুগ সত্যকে অনেকটা অস্বীকার করে আপন আদর্শগত সত্যকে মূল্য দিয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, কবি রামকৃষ্ণ কিন্তু পৌরাণিক ভাবাদর্শের প্রচার করতে চাইলেও লৌকিক জীবনকে পরিহার করতে পারেননি। শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল অংশে লৌকিক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে অপূর্ব জীবন বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর অপরদিকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য যুগরুচি ও রসবোধকে আশ্রয় করে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের শিবঠাকুর শিথিল চরিত্র নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ সমাজপতি। বস্তুতপক্ষে শিবায়নের শিবঠাকুর কৃষিজীবী সমাজের দেবতা। চণ্ডীমঙ্গলের ভিখারী শিবের সূত্রটি বহন করে শিবায়নে প্রথমে শিবঠাকুরের ভিখারী রূপের পরিচয় পাই কিন্তু পরবর্তীকালে সে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়েছে। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৃত্তি ও জীবিকা পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে চার বর্ণের পাশাপাশি বৃত্তিভিত্তিক ভাবে গড়ে ওঠা জীবিকার চিত্র পাই। শিবায়নে চার বর্ণের প্রাধান্য নেই। বৃত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জনজীবনের কথাও নেই। অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের লক্ষে শিবঠাকুর কখনো কৃষিকার্য গ্রহণ করেছে আবার কখনো সে শাঁখারী হয়ে শাঁখা বিক্রি করেছে। অর্থাৎ লৌকিক কাহিনী আশ্রিত শিব কাহিনীতে মানুষের মিশ্র বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মা তো এখানে দেবশিল্পী নয়, সে কখনো কর্মকার হয়ে ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙলের ফাল, দা, কোদাল তৈরী করেছে আবার কখনো ছুতোরের বৃত্তি গ্রহণ করে কাঠ কেটে লাঙল, জোয়াল তৈরী করেছে, আবার কখনো বা শঙ্খ কেটে শাঁখা তৈরী করেছে। বস্তুতপক্ষে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছত্রিশ জাতির পরিচয় এখানে নেই। অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই ভেদাভেদ লোপ করে জীবিকার প্রয়োজনকে বড় করে দেখেছিল। তবে এর পাশাপাশি কামার, কুমার, ছুতোর, তাম্বুলী, শাঁখারী, চাষা ইত্যাদি বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের তথাকথিত বৃত্তিজীবীতার অবসান হতে চলেছিল, তাইতো শিবঠাকুর বলেছিল—

"মাগে হর তেপান্তর কোচ পাশে পাড়া
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥" (ঐ/২২৩)

এই সময়কালে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। শিবায়নে তার সম্পূর্ণ

পরিচয় নেই বরঞ্চ এখানে একই শিবঠাকুর কখনো ভিখারী, কখনো কৃষক, আবার কখনো বা বণিক।

শিবায়ন কাব্যে মঙ্গলকাব্যের ধারাটিকে বজায় রেখে নারীর অবস্থান ও ক্রমবিবর্তনের কথা পাই। শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত সমাজ পিতৃতান্ত্রিক অর্থাৎ পুরুষশাসিত। নারীর অবস্থান এখানে সঙ্কুচিত। ধর্মমঙ্গলে যে সমস্ত নারীদের পাওয়া যায় তারা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কিন্তু সমাজের নারী সম্পর্কিত প্রবণতাটি ছিল স্বতন্ত্র, সেখানে নারীকে সমাজ নানা বাঁধনে আবদ্ধ করে রাখার জন্য নানা বিধিনিষেধের গণ্ডীতে বাঁধত। সমাজে নারীর সতীত্বের মূল্য ছিল যথেষ্ট। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার মুখে কিংবা ঘনরামের কাব্যে লাউসেনের মুখে নারী সম্পর্কিত ভাবনার প্রতিধ্বনি পাই রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন সমাজের নারী সম্পর্কিত বিশ্বাস ও ধারণা শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যাই। যেমন—

"স্বামী বিনে রমণীর আর নাহি গতি।
যে করে পতির ভক্তি সেই ভাগ্যবতী॥
... ...
বৃদ্ধ বা দরিদ্র জড় যদি হয় পতি।
কন্দর্প সমান দেখে সেই নারী সতী॥
কোপদৃষ্টে স্বামী যদি চাহে মনোদুঃখে।
পতিব্রতা পতিরে সম্ভাষে হাস্যমুখে॥" (রামকৃষ্ণ/১৪৩)

বাঙালী সমাজের নারী ছিল পুরুষের উপর নির্ভরশীল, একারণে স্বামী বিনে নারীর গতি ছিল না। বস্তুত, নারী কার্যে দাসী, ভোজনে ও স্নেহে মাতা, শয়নে বেশ্যা এই ধারণা মধ্যযুগীয় মানসিকতায় নারী সম্পর্কিত প্রকৃত অবস্থান। রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন-

"সকল প্রকারে তুমি জানাইবে শীল।
স্বামী ছাড়ি কোথাও না যাবে এক তিল॥
কার্য্যকালে দাসীর সমান পতিব্রতা।
ভোজন সমএ স্নেহ করে যেন মাতা॥
শয়নে বেশ্যার ভাব বিপত্ত্যে মন্ত্রিণী।
সুস্ত্রীর লক্ষণ এই শুন গো ভবানী॥" (ঐ)

মধ্যযুগীয় সাধারণ বাঙালী নারী ছিল অশিক্ষিত। চণ্ডীমঙ্গলে এবং ধর্মমঙ্গলে কয়েক জন সামান্য শিক্ষিতা নারীর সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু শিবায়নের নারীগণ অশিক্ষিত বলেই বোধ হয়। বস্তুতপক্ষে এযুগে নারীর শিক্ষা ছিল নিষ্প্রয়োজন, তাই কোথাও বাল্যকালে নারীর শিক্ষার কথা বলা হয়নি। হরগৌরীর সংসারযাত্রা অংশে আমরা যে নারীকে পাই কিংবা রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গঙ্গা-দুর্গার কলহ অংশগুলিতে নারীর কলহপরায়ণতা এবং যে রুচির প্রকাশ পাই তাতে তাদের শিক্ষিত বলে মনে করাও কষ্টকর। বস্তুতপক্ষে নারী এই স্বাভাবিক জীবনকেই গ্রহণ করেছিল। মনসা বা চণ্ডী, কানড়া বা কলিঙ্গার মত নারীকে আমরা এখানে পাই না। তবে লক্ষণীয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসারিক অমঙ্গল-অবনতির জন্য নারীকে দোষারোপ করে তৃপ্ত হত। তাই কবি বলেছেন—

"গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেল্যা দিয়্যা পুরুষ পাসরে সে কি জানে॥
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ কর্য্যা উথলয়ে গারি॥
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মায়্যা।

শতকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়্যায়া॥" (রামেশ্বর/২১৫)

মনসা যেখানে কঠোর সংগ্রামে নেমেছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, চণ্ডী সহজেই সেই প্রতিষ্ঠা আদায় করেছিল, শিবায়নে এসে গৌরী কিন্তু শিবের অকর্মণ্যতা ও ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। গৌরীর কঠোর নির্দেশ, হয় চাষ চষ, নয় পরিবার পরিজন পরিত্যাগ কর—

"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন॥" (ঐ/২১৬)

বস্তুত শিবায়নে অলস অকর্মণ্য, সৃষ্টিছাড়া ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক শিবঠাকুর আপন ঐশ্বর্যকে হারালেও হৃত ঐশ্বর্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল। সেকালে কৃষিকাজ ব্রাহ্মণ সমাজ ভাল চোখে দেখেনি। চিরকালীন বৃত্তি পরিত্যাগ করে নতুন বৃত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের মনে হয়েছে—

"কাদা পানি খায়্যা ক্ষেতে কর্য়া চাষিপনা।
নরোত্তম ছাড়্যা নরাধম উপাসনা॥" (ঐ/২১৭)

'দেবতার পোত বৃত্তি বড়ই লঘুতা' মনে হলেও মঙ্গলময়ী নারীর কঠোর নির্দেশে শিবঠাকুর বাধ্য হয়েছিল ত্রিশূল ভেঙ্গে চাষবাস আরম্ভ করতে। মনে হয় পতিব্রতার মাহাত্ম্য ঘোষিত হলেও নারী পতিদেবতার বাক্যকে বেদবাক্য বলে মনে করেনি। মনে হয় শিবের ত্রিশূল ভেঙ্গে চাষবাস আরম্ভ নারী কর্তৃত্বের খানিকটা প্রতিষ্ঠা। তাই ক্ষিপ্ত দেবাদিদেব ক্ষুণ্ণস্বরে বলে ফেলে—

"শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।
ফাল কর আপনার চক্র কর্য়া লোপ॥
গায় হাত দিয়ে কথা কও নাই বটে।
শূলপাণি লোপ হেতু লাগিয়াছ হটে॥ (ঐ/২১৯)

তাই শূলের মাহাত্ম্য যতই ঘোষিত হোক নারী পুরুষকে দিয়ে আপন ভাত-কাপড়ের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে, তাই গৌরীর নির্দেশে শিবের চাষবাস। শুধুমাত্র পুরুষ বা নারীর দ্বারা সংসারের সকল মঙ্গল সম্ভব নয়, তাই নারী পুরুষ মিলে যৌথ প্রচেষ্টায় শিবের বলদ আর গৌরীর বাঘ দু'য়ে মিলে জমি কর্ষণের সূত্রপাত। বিপথগামী পুরুষকে ঘরে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় গৌরীর বাগদী নারীর বেশ ধারণ এবং নিজ দাবী আদায়ের প্রচেষ্টায় 'শঙ্খপরা' পালার আয়োজন। ঘরের নারীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শিবঠাকুরকে কৃষিকার্যের পাশাপাশি ব্যবসায়বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।

সে সময়ের বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যা রজঃস্বলা হবার আগেই পাত্রস্থ করতে হত। কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য বালিকার বিবাহ দিতে হত, ফলে বালিকা কন্যার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তার অবধি থাকত না। শিবায়নে বালিকা বধূর করুণ কাহিনী কবি চিত্রিত করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলার সরল জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে এর মধ্যে দিয়ে। অসহায় বালিকা বধূর দায়িত্ব জামাতার হাতে দিয়ে শাশুড়ী জামাতার হাত নিজের মাথায় দিয়ে দিব্য করাচ্ছে, জামাতা যেন কন্যার সকল দোষ ক্ষমা করে মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে—

"কান্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ॥
জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে॥
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি॥

আঁঠু ঢ্যাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ॥" (ঐ/৫২)

বস্তুতপক্ষে কৌলীন্য প্রথাশাসিত সমাজে কন্যার অবস্থার কথা জেনে ভীতা মা মেনকা জামাতাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়েছে। মেনকা সমাজে নারীর অবস্থানগত সত্যকে জানে বলেই কন্যার জন্য বিলাসিতা চায়নি, শুধু মোটা ভাত কাপড়ের প্রত্যাশাই করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুবতী নারীর পক্ষে পথঘাট তো নয়ই নিজ গৃহও সর্বদা নিরাপদ ছিলনা। মানুষ কু-লোকের কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও বালিকা কন্যাকেই বিবাহ দিতে বাধ্য হত। অতিথি, ভিখারী, ফকিরের দৃষ্টিপথ থেকেও ঘরের যুবতী কন্যাকে আড়ালে রাখতে হত। তাইতো গৌরীর জননী বলেছে—

"ভালই আছিলুঁ উমা যখন ছাওয়াল।
যৌবন শরীর রূপ মোরে হৈল কাল॥
কত দিনে বিভা হইবেক মোর মাথা খাইয়া।
অতিথ দেখিলে কত রাখিব লুকাইয়া॥" (রামকৃষ্ণ/১০১)

কৌলীন্য প্রথা ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে কন্যার পিতা বৃদ্ধ, পঙ্গু, কানা, খোঁড়া যে কোন রকম কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিত। তাই নারীর পতিনিন্দা অংশে নারীগণ নিজ নিজ স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে স্বীয় স্বামীর নিন্দা করেছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে 'শাশুড়ীদের জামাই নিন্দা' একটি বিশেষ অংশ। কন্যার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শাশুড়ীরা জামাতা নিন্দা করেছে—

"খোঁড়া বরে খুজ্যা দিনু খুদি হেন ঝি॥
সোনস্যা সুন্দরী নারী তাকে নাকি সাজে।
পাদ কুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে॥
... ...
মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সাধ্যা আন্যা বেতী দিল বাপ॥" (রামেশ্বর/৮৯-৯০)

এই অংশগুলিও নারী প্রগতির এক ধাপ বলে ভাবা যায়। যুবতী নারীদের পাশাপাশি বয়স্কা নারীগণও এই অংশগুলির মধ্যে দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করেছে।

বাঙালী নারীর জীবন ছিল এক ছকে বাঁধা। শিক্ষাদীক্ষাহীন, ব্যক্তিচেতনাহীন নারীকে বাল্যকাল থেকেই গড়ে তোলা হত গড়পরতা মানসিকতা দিয়ে, তাই বাল্যে বালিকার মনে ঘর-সংসার, পুত্র-কন্যা, নির্ভরতা ইত্যাদি প্রচলিত ধারণাগুলি গড়ে উঠত। তাইতো বালিকার ক্রীড়া রান্নাবাড়ি, ঘর সাজানো, পুতুলবিয়ে ইত্যাদি। লক্ষণীয় বিষয় শিবায়নে নারী পুরুষশাসিত সমাজের এই মানসিকতার প্রতিবাদ করেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তাই বৃদ্ধ জামাতা দেখে মেনকা হিমালয়কে তিরস্কার করেছে মাত্র, কিন্তু রামেশ্বরের শিবায়নে মেনকা জানিয়েছে কন্যা তার কাছে দায় নয়, তাই বৃদ্ধ বরে সে কন্যা সমর্পন করতে চায় না। বরং নারী বৃদ্ধ বরকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছে। সে বলেছে—

"বিহার দায় নাই দায় নাই।
মৈনাক মোর বাপ হ বল গিয়া তোরা গো
কন্যার মায়ের মনে বর ভায় নাই॥

ভাতার চক্ষের মাথা খায়্যা বর আন্যাছেন দিবেন মায়্যা।

ছি ছি ছি ছি কি বলিব তারে।

খেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্কা মার‍্যা বাহির কর

আইবড় মোর ঝি থাকুক মোর ঘরে॥ (ঐ/৮২)

এর মধ্যে দিয়ে যুগাচারের মধ্যেও নারীর যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে।

শিবায়ন কাব্যেও বাঙালীর পারিবারিক গঠনচিত্র পাওয়া যায়, সেখানে সকলকে নিয়ে সুন্দর পরিবার জীবন নির্বাহ হত, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে পরিবার জীবন গড়ে উঠত। গৌরীর গৃহস্থালী চিত্র বর্ণনায়, শিবের ভোজন অংশে সুন্দর গৃহস্থালী চিত্র আছে। গৌরী সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী, অভাব অনটনের মধ্যেও সে নিপুণভাবে সংসার পরিচালনা করে। শিব সংসার উদাসীন, তার জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। আয় সামান্য হলেও সে ভোজনপরায়ণ। গৌরীঠাকুরানী অভাবের সংসারে প্রত্যহ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের বন্দোবস্ত করে, পরিপাটি রূপে স্বামী-পুত্রকে খাওয়ায়। শিবের সংসারে ভোক্তা কম নয়, স্বামী-স্ত্রী, দুটি পুত্র, ভৃত্য ভীম, তিন দাসী— জয়া, বিজয়া ও পদ্মা, আট জনের সংসার ভিক্ষান্নে চলে না। তাই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে কলহও হয়। ধার করজ করেও আর সংসার চলে না। ধনীর দুলালী দরিদ্র স্বামীর ঘরের সর্বংসহা গৃহিণী, তার বাস্তব চিত্র আছে এখানে—

"রঙ্গিনী রাজার বেটী রুখু করি স্নান।

তৈল বিনে তনু ক্ষীণ খড়ি উড়্যা যান।" (ঐ/১১১)

শুধু তাই নয়, পুত্র দুটি পথ চেয়ে থাকে। শিব ভিক্ষা থেকে ফিরে এলে দুই ভাই ঝুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ক্ষুধিত পুত্রদ্বয় পিতা আনীত খাদ্যদ্রব্য গোগ্রাসে গিলতে থাকে। দুর্গা গণেশকে ধমক দিয়ে কনিষ্ঠ কার্তিককে কিছু দিতে বললে কার্তিক-গণেশের কলহ দূর হয়— এ চিত্রগুলি আসলে মধ্যযুগীয় দরিদ্র পরিবার চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে সুস্থিত পরিবার জীবন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মা, বাঙালী পরিবারে যাবতীয় দায়ভার মাকেই বহন করতে হত। দেখা যায় পুত্রেরা বাপের কাছে বসে থাকলেও ক্ষুধা পেলে মায়ের কাছেই খেতে চায়—

"এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।

ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দেনা গো॥" (ঐ/১১০)

শুধু কি তাই, সর্বসংহা বাঙালী জননী পুত্র-কন্যা স্বামীর যাবতীয় উপদ্রব নিরুপদ্রবে সহ্য করে. কারণ পুত্র হতে পিতার প্রতাপ অতিশয় ছিল। মঙ্গলকাব্যে বাঙালী জননীর স্নেহপরায়ণ হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ দেখি। সে আপন সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল হয়, কখনো বালিকা কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে বিচলিত হয়, জামাতার কাছে কন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি নেয়, আবার বহুদিন পরে কন্যাকে কোলে পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর কন্যাকে জামাতা গৃহে পাঠাবে না। কবির বর্ণনায়—

"পাঠায়্যা পরের ঘরে কান্দিয়া তোমার তরে

অভাগী মায়ের দেখ হাল।

আর না পাঠাব আমি ভাল হৈল আল্যে তুমি

মোর ঘরে থাক চিরকাল॥" (ঐ/২৯৯)

রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতেও মা মেনকার কণ্ঠে এই খেদোক্তি শোনা যায়।কিন্তু বাঙালী জননীর হৃদয় ব্যাকুলতা ভিন্ন করণীয় কিছু থাকত না। কেননা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক, তাই তাকে সবই দৈবের নির্ঘন্ট বলে মেনে

নিতে হত। তাই মা মেনকার বক্তব্য—

"ননীর পুতলী ছাল্যা জ্বলন্ত অনলে ফেল্যা

বাপ দিলে কি করিবে মায়।

আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডাত্যে পারি

কপাল খণ্ডান নাহি যায়।" (ঐ)

সুতরাং কয়েক দিন কন্যাকে নিয়ে আনন্দে থাকলেও যথারীতি আবার থাকে পতি গৃহে পাঠাতে হত। কারণ বিশ্বাস করা হত কন্যার প্রকৃত অবস্থান পতিগৃহে—

"স্বামী ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ মাকে

অভাগার ঘরে থাকে ঝি।" (ঐ/৩৪৪)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী পরিবারের ঘরজামাই রাখার প্রথা ছিল, কিন্তু এই প্রথা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কবি তাই বলেন—

"করিয়া শ্যালক সেবা শ্বশুরান্নে জীয়ে যেবা

তাহার জীবনে থাক ধিক্।" (ঐ/৯৫)

সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং একারণে সপত্নী সমস্যা একটা বড় সমস্যা ছিল। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে গঙ্গা-গৌরীর কলহ বর্ণনা অংশে তার সুন্দর পরিচয় আছে।যাই হোক না কেন, বাঙালীর এই পারিবারিক বাঁধন মধ্যযুগেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণে। কেননা দারিদ্র্য শতেক গুণরাশি নাশ করে। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে কবি লিখেছেন—

"প্রভুর যতেক গণ নাহি পায় ভক্ষ্য।

পার্ব্বতী বলেন মোরে হইল অশক্য॥

যত জনে ঘর কেহ নহে কারো বশ।

বাঁটিতে না আঁটে গৃহিণীর অপযশ॥" (রামকৃষ্ণ/২৩৫)

পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার উপর যে পরিবার জীবন দাঁড়িয়েছিল মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে দারিদ্র্যের কষাঘাতে তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

বাঙালী সমাজে নারী ছিল পর্দানসীন। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে যে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল তা গৌরীর উক্তি থেকে জানা যায়। শিব গৌরীকে ঋণ করতে বললে গৌরী জানিয়েছে ঋণ করা নারীর কর্ম নয়, নারীর স্থান গৃহাভ্যন্তরে। ঋণী পুরুষ মহাজনের সামনে ঘরের স্ত্রীকে ঠেলে দিত, কিন্তু কুলবধূরা পর্দানসীন থাকত আর মহাজনের সঙ্গে কথা বলত ছেলে। এ প্রসঙ্গে গৌরীর উক্তি স্মরণযোগ্য—

"মদ্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে।

ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥

মদ্দের করজ হৈলে মায়্যা দেয় ট্যালা।

কোণে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছ্যালা॥" (রামেশ্বর/২২৯)

নিম্নবর্ণের সমাজে পর্দাপ্রথার বালাই ছিল না, তারা ছিল স্বাধীন। যেখানে সেখানে তারা ইচ্ছা মত যাতায়াত করতে পারত। জীবন-জীবিকায় তারা অনেকটা স্বনির্ভর হত এবং প্রয়োজনে পুরুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়াত। ধর্মমঙ্গলে

ডোম নারীগণের মধ্যে দিয়ে এই তথ্য পাওয়া যায়। শিবায়নে বাগদিনীর রূপ ধারণ করে গৌরী বলেছে, তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে সুতরাং খাল- বিলে মাছ ধরে হাটে হাটে বিক্রি করে তার দিনাতিপাত হয়। বস্তুতপক্ষে এটি নিম্নবর্ণের সমাজের একটি সত্যমূলক তথ্য।

বাঙালী নারীর মানসিক ও চারিত্রিক প্রবণতাগুলিও শিবায়ন কাব্যে উঠে এসেছে। উৎসব অনুষ্ঠানে, বিবাহে পাড়াপড়শী সকলেই অংশ গ্রহণ করত; নববর বা নববধূ দেখার জন্য বাঙালী গ্রাম্য নারীরা কিভাবে ছুটে আসত তার চিত্র ফটোগ্রাফির মত ফুটে উঠেছে। রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে গৌরীর বিবাহে বর দেখতে আসার জন্য নারীদের যে আচরণ, বোধ হয় তা বাঙালী সমাজ ব্যতীত অন্যত্র প্রত্যক্ষ নয়। যেমন,রামকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে-

"কেহ ধাইআ আইল করে ধরিআ মুকুর।
কেবল সীমন্ত মাত্র নাহিক সিন্দুর।
... ...
বালক পেলিআ ঘরে চলিল কামিনী।
ভাদ্রের সরিৎ যেন সমুদ্রগামিনী॥" (রামকৃষ্ণ/১৩৮)

রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ শিবায়নের আভ্যন্তরীণ গঠনে রাজনৈতিক জীবনের ছোঁয়া নেই। সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ওঠাপড়া যেভাবে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত তার ছোঁয়া সহজে জনজীবনের গভীরে প্রভাব ফেলতে পারত না। কাহিনীগত জটিলতা মুক্ত হওয়ায় শিবায়নে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির স্পর্শ নেই। তবে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ফলশ্রুতি জনজীবনকে প্রভাবিত করত। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ শাসকের দ্বারা কর ভারে জর্জরিত হত, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলেও কর মুক্তি ঘটত না। রামেশ্বরের কাব্যে শিবঠাকুরের কথায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ শিবায়নে অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল তার প্রারম্ভিক প্রস্তুতির কথা আছে শিবায়নে।

কৃষি ঃ অন্ত মধ্যযুগ অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরী তেমন প্রচলিত হয়নি, ফলে কৃষিই ছিল একমাত্র সম্বল। বাংলাদেশের ভূমি ছিল উর্বর, ফলে স্বল্প শ্রমদানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য কাব্যে শিবের চাষবাস প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ করেছেন। গৌরী ঠাকুরানী ছদ্মবেশে শিবঠাকুরের খোঁজে এসে শিবঠাকুরের ক্ষেতে ধান দেখে চমৎকৃত হয়েছে—

"যুক্তি কর্য়া পার্ব্বতী পদ্মারে লয়ে সাথে।
অবতীর্ণ মহামায়া মহেশের ক্ষেতে॥
ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥ (রামেশ্বর/২৫৬)

তুর্কী আক্রমণের প্রথম যুগেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ হিন্দুসমাজ থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে আর হৃত সম্মান উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সমাজে বণিকগণ অর্থনীতির নতুন আলোকে উঠে এসেছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ ব্যবস্থাই ছিল কৃষি নির্ভর। দরিদ্র ব্রাহ্মণরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে পড়ায় কৃষিতে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে দুর্গা বলেছে, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়েছে—

"ভিক্ষার উপরে ভর নানাজাতি পোষ্য।
বাণিজ্য নাহিক চাষে না উপজে শস্য।" (রামকৃষ্ণ/২৩৫)

কিন্তু দেব-ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিবৃত্তি শোভাকর নয়, তাই কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করতে শিবের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব—

"দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥" (রামেশ্বর/২১৬)

যাই হোক, গৌরীর অনুরোধে শিবঠাকুর চাষবাস করার জন্য বিশ্বকর্মার কাছ থেকে লাঙল, জোয়াল তৈরী করে নিল। বিশ্বকর্মা শিবঠাকুরের প্রতিবেশী বিশাই কামার। শিব নিজ হাতের লোহার ত্রিশূল ভেঙ্গে দা, ফাল, কোদাল তৈরী করে নিল, দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ভূমি পাট্টা নিল এবং কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান ঋণ করল, শেষে নিজের বলদ আর গৌরীর বাঘ নিয়ে, ভীম নামক মাহিন্দারকে নিয়ে মর্ত্যলোকে জমি চাষ করার জন্য যাত্রা করল-

"চলে বৃষে চন্দ্রচূড় চণ্ডী রন চায়্যা।
পাছে ভীম চলিলা চাষের সজ্জা লয়্যা॥" (ঐ/২৩৩)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষিকাজ নিন্দনীয় ছিল না, বরঞ্চ সম্মানজনক বৃত্তি বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণরাও চাষবাসকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তার পরিবারের যজমানি বৃত্তির পাশাপাশি চাষবাসের কথা বলেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা চাষবাসকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

মধ্যযুগের কৃষিকাজ আদিম পদ্ধতিতে হলেও অনুন্নত ছিল না। সাধারণ কৃষকের কৃষি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। চাষীকে কৃষিকার্য ও ফসল সংগ্রহ করার জন্য অনেক সময় দূরবর্তী ক্ষেত্রে বসবাস করতে হত। ফসল সংগ্রহ করে তবেই চাষী ঘরে ফিরত, একারণে বছরের ছয়-সাত মাস তাকে গৃহছাড়া হয়ে থাকতে হত। শিবঠাকুর কৃষিকার্যের জন্য দেবলোক ছেড়ে মর্ত্যে গিয়েছিল। সেকালে চাষবাসের জন্য লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি ব্যবহার করা হত, আর চাষের কাজে বলদ গরুই ছিল চাষীদের সম্বল। জলসেচের জন্য কোন উন্নত পদ্ধতি ছিল না। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চাষবাস আরম্ভ হত। শিবের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে রামেশ্বর লিখেছেন—

"মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরষিলা॥
দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥" (ঐ/২৩৩-২৩৪)

সাধারণত জলসেচের জন্য নিকটবর্তী নদী-নালা, খাল-বিল থেকে জল ব্যবহার করা হত, অনেক সময় বৃষ্টির জল আল বেঁধে খালে আবদ্ধ করে রেখে দেওয়া হত। কবির বিবরণ অনুসারে—

"দুদণ্ডে ছাড়িয়া হাল হাল্যা গেল ঘরে।
বান্ধ আলি বৈকালে বান্ধিল একপরে॥" (ঐ /২৩৪)

রামেশ্বর সেকালের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন—চৈত্রমাসের শেষে জমিতে লাঙল দেওয়া, মই দেওয়া ও মাটি সমান করা শেষ হত, বৈশাখ মাসে শুভদিন দেখে জমিতে বীজ বুনে দেওয়া হত। কবির বিবরণে আছে—

"চৈত্র মাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।
মাঠ কর্য়া মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ॥
উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার্য়া সব ভূমি বাতে বুনে॥" (ঐ/২৩৭-২৩৮)

কৃষকরা কৃষির পাশাপাশি পশুপালনও করত, আসলে নিজের হালের গরুগুলিকে চাষীরা নিজেই প্রতিপালন

করত। তাই কবি বলেন—

"হাল ছাড়্যা হাল্যা যবে করে জলপান।
হেল্যাকে চরান শিব হয়্যা সাবধান॥" (ঐ/২৩৭)

শুধু তাই নয়, চাষীরা পশুদের যত্ন ও চিকিৎসার কাজও জানত। গাছ-গাছড়া টোট্‌কা চিকিৎসায় তারা পশুর চিকিৎসা করত। কবির অভিজ্ঞতা অনুসারে—

"দিন দশে দু হেল্যার কান্ধ গেল রস্যা।
ধুতরার রস তাতে শিব দিল ঘস্যা॥" (ঐ)

চাষবাস সম্পর্কে তারা কতটা বিজ্ঞ ছিল তা জানা যায়। চাষ সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কার ছিল, নিষিদ্ধ সময়ে চাষ করলে চাষীর ও ফসলের ক্ষতি হয় বলে বিশ্বাস করা হত। তাই —

"হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্য মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো॥
সেই সেই কালে যার হয় হল যোগ।
ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষীছাড়া। (ঐ)

এসময় হালচাষ বন্ধ থাকলেও কৃষিকার্য বন্ধ থাকে না, চাষী ক্ষেতের আগাছা পরিস্কার করে—

"হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।
গাছি মার‍্যা হরা গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা॥" (ঐ)

চাষবাস সম্পর্কে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ আছে এই অংশগুলিতে। বৃষ্টিতে যাতে ফসল নষ্ট না করে তার জন্য উত্তর দিকে উঁচু করে এবং দক্ষিণ দিকে নীচু করে জল গড়িয়ে যাবার নালা রাখা হত। যেমন—"দক্ষিণে মোহনা রাখে জল যাত্যে নালা।" (ঐ/২৩৪)। আর মাঠে সোনার ফসল ফললে, চাষী ফসলের মোহে ঘর-সংসার ভুলে যেত—

"হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম॥
হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখা রহিল পাসর‍্যা পরিজন॥" (ঐ/২৩৮)

সোনার ফসল ঘরে তুললেও কিন্তু চাষীর অন্তরে খুব একটা সুখ থাকত না, কারণ চাষের যাবতীয় খরচ তার ঋণে; কারো জমি, কারো বীজধান, লাঙল-জোয়াল ধার নিয়ে চাষী চাষ করত। শিবঠাকুর বিশাই কামারকে দিয়ে বিনা বেতনে লাঙল-জোয়াল তৈরী করিয়েছে, ইন্দ্রের কাছে জমির পাট্টা নিয়েছে। ইন্দ্র চাষের অর্থ জোগাতে চাইলেও শিবঠাকুর নেয়নি, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে জমিদার-মহজনকে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না।কবির বিবরণ অনুসারে জানা যায় কৃষকরা ক্রমাগত জমিদার ও মহাজনের দ্বারা শোষিত হত। ইন্দ্র শিবঠাকুরকে জমি দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু—

শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
ক্ষেতে খন্দ দেখ্যা তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাটুকি হল্যা পর কাল শুদ্ধ হয়॥" (ঐ/২২৩)

যেহেতু শিব ব্রাহ্মণ তাই দেবরাজের কাছে সে জমি দেবোত্তর হিসেবে পাট্টা করে নিয়েছে। সেকালে ব্রাহ্মণরা দেবোত্তর পাট্টায় নিষ্কর জমি পেত। শিবঠাকুর দেবরাজের কাছে নিষ্কর পাট্টা নিয়েছিল—

"মসীপত্র হাতে লয়্যা কশ্যপের বেটা।
লেখ্যা দিল দেবদেবে দেবোত্তর পাটা॥
বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী ডাট ডোট নাই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥" (ঐ/২২৪)

চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত। উৎপাদিত ধান বীজের জন্য অর্ধেক রেখে বাকী অর্ধেক খাবার জন্য ব্যবহার করত।কবি এসম্পর্কে লিখেছেন—

"অর্দ্ধ ভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে।
পুড়া ভাঙ্গ্যা ফেল্যা রাখ পড়্যা থাক ঘরে॥
চাকরের চারা নাই যে করেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াইবে ভাত॥" (ঐ/২৩৫)

চাষের সময় চাষীকে কোন রকমে শাক পাতা খেয়ে ফসল ফলাতে হত। তাই—

"ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।
কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা॥" (ঐ/২৩৮)

কিন্তু ফসল ঘরে উঠলেও চাষীর সুখের দিন আসত না, কারণ জমিদার-মহাজন সকলের লোলুপ দৃষ্টি পড়ত ঐ ফসলের উপর। তাই শিবঠাকুর পার্বতীকে তার সমাজ অভিজ্ঞতার কথা দুঃখ করে বলেছে-

"শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর।
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাই ডর॥
চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥
অনেক যতনে ক্ষেতে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার কর্য়া সকল আনয়ে লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখ্যা খন্দ যদি খাত্যে নাই পায়।
কুতকাতে কায়েত কিফাত করে তায়॥" (ঐ/২১৭)

সুতরাং অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে চাষীর দুর্দশার সীমা থাকত না। রামেশ্বর ভট্টাচার্য সেকালের চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব অবস্থা বর্ণনায় প্রাবন্ধিকের মত যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

বাণিজ্য ঃ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাণিজ্য প্রসারলাভ করেনি। এই শতকের বাঙালী সুদূর অতীতের চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছিল। বাণিজ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা সাধারণ জনসমাজে ছিল না। এসময়ে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না. কেননা মানুষের হাতে এখনকার মত রৌপ্যচক্রের আমদানী হয়নি। বাণিজ্যকে লোকে হীন চোখে দেখত। তবে বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির খবর জনসমাজে প্রবাদের মত ছড়িয়ে ছিল. কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সাধারণ মানুষের হাতে

একেবারেই ছিল না। তাছাড়া ব্যবসা অর্থেই প্রবঞ্চনা বোঝাত, তাই ধর্মপরায়ণ সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণীয় ছিল না । তাই গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের কথা বললেও তার পুঁজির অভাব। তাই শিবঠাকুরের উক্তি—

"চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥
বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়।
বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমার নয়॥
পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সেত নাই কিসে সুপ্রতুল॥" (ঐ/২১৭)

কিন্তু আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে কামার, কুমার, ছুতোর, নাপিত, রজক, মোদক, শাঁখারী ইত্যাদি বৃত্তিজীবী শ্রেণী স্বীয় বৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষি কাজের ফলে খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা ছিল না, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের আয়োজন তাতে হত, কিন্তু হাতে কাঁচা পয়সার অভাবে টাকা-পয়সার বিনিময়ে ক্রীত জিনিসপত্র যোগানো সম্ভব ছিল না। শিবের সংসারে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই কিন্তু অর্থের অভাব, তাই গৌরীকে এক জোড়া শাঁখা কিনে দেবার সামর্থ্য তার ছিল না। শিবের উক্তিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোনা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥
... ...
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান।
স্বতন্ত্ররা বট শঙ্খ পর নাই কেন।" (ঐ/২৮০)

সুতরাং গৌরীর শঙ্খ পরিধানের শখ মেটাবার জন্য স্বয়ং শিবঠাকুরকে শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে। সেকালে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে শাঁখারীরা শাঁখা বিক্রি করত। বৃদ্ধ বয়সে শিবকে কাঁচা পয়সার জন্য বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে–

"পসরা প্রস্তুত কৈল অনেক যতনে॥
শঙ্কর ধরিল শঙ্খ-বণিকের বেশ।
তিনকাল পূর্ণ হৈল পাক্যা আল্য কেশ॥" (ঐ/৩০৪)

আরো পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে গৌরী শিবঠাকুরকে ভিক্ষা নয়, চাষ নয়, বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে। চাকুরী গ্রহণ তখনো প্রতিষ্ঠিত বৃত্তির মানসিকতায় আসেনি, শিবায়নে এই তথ্য পাওয়া যায়। কারণ যারা সমাজে এতদিন সেবা পেয়ে এসেছে তাদের পক্ষে পরের সেবাবৃত্তি গ্রহণীয় হয়নি। গৌরী শিবঠাকুরকে বলেছে—

"আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে।
সেব্য হয়্যা যাবে কেন সেবকের কাছে॥" (ঐ/২১৭)

কিন্তু চাকুরীকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা যে সাধারণ জনসমাজে এসেছে তা ধর্মমঙ্গল কাব্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয়, এই পর্বে ব্রাহ্মণ রাজসেবা বৃত্তি গ্রহণ করেনি। কায়স্থ বা শূদ্র বা অন্যান্য জাতির মানুষই এই বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। শিবায়নে দেখি এক শ্রেণীর মানুষ খাওয়া পরার বিনিময়ে মজুরবৃত্তি গ্রহণ করেছে. ভৃত্য ভীম

তার উদাহরণ।

শিল্প ঃ প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই বাংলার কুটীরশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। কাঠের কাজ, অলঙ্কার শিল্প, লোহার কাজ, সূচীশিল্প, অলঙ্করণ শিল্প ইত্যাদি কুটীরশিল্পের পরিচয় আছে শিবায়নে। কাঠ কেটে আসবাবপত্র ছাড়া, লাঙল, জোয়াল তৈরীর কথা পাই শিবায়নে। কর্মকাররা লোহা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করত। বাংলার অলঙ্কার শিল্পের বৈচিত্র্যের কথা আছে মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায়। সূচীশিল্প, চিত্রশিল্পে গ্রামীণ শিল্পীরা বৈদগ্ধের পরিচয় দিত। শিবায়নে আমরা শঙ্খশিল্পের কথা পাই, শিবঠাকুর নিজেই শঙ্খ কেটে শাঁখা তৈরী করেছে এবং অলঙ্করণ করেছে, স্বয়ং শাঁখা বিক্রেতা হয়ে শাঁখা বিক্রি করেছে।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। সুস্থিত প্রশাসনের অভাবে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। সাধারণ মানুষের উপর কর ভার আরোপের ফলে জনগণ কর্পদক শূন্য হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত মুষ্ঠিমেয় ধনীরা, আর জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে জনগণের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনা ছিল শুধু খেয়েপরে বেঁচে থাকা, তার জন্য মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা। পেট ভরা ভাতের জন্য মানুষ অন্যের গৃহে বেগার খাটত, তবুও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পরতে পেত না। ভৃত্য ভীমের উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

"ক্ষেতে খাট্যা ক্ষুধা বড় খাব কিহে মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষমা॥
শিববাক্য শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ গেল জ্বল্যা।
ডাক্যা বলে ডাকাত্যে মাল্যেক মোকে বল্যা॥
সর্ব্বকাল সারাদিন কর্ম্ম করি তবু।
পেট ভর‍্যা ভাত মোর দিলে নাই কভু॥" (ঐ/২৩৪)

শিবায়নে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানগত দিকটিও ফুটে উঠেছে। ধনী জমিদার ও মহাজনরা সাধারণ দরিদ্র মানুষক ঋণদান করত, ফলে চাষীর উৎপাদিত ফসলের অনেকটাই চলে যেত জমিদার ও মহাজনদের ঘরে। ধনীদের ঘরে ছিল ঐশ্বর্যের যাবতীয় আয়োজন। তবে সাধারণ মানুষ অভাব অনটনের মধ্যেও উৎসব-অনুষ্ঠানে আনন্দে মত্ত হত। রামেশ্বর ধনী দরিদ্রের পার্থক্যগত দিকটি উল্লেখ করেছেন—

"ত্রিপুরে ত্রিপুরোৎসব রব সব ঠাঞি।
অভাগা বিমুখ যার পরলোক নাই॥" (ঐ/৩০১)

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যেও তার সমকালীন মানুষের সমৃদ্ধির ছাপা আছে।

ধর্মজীবন ঃ মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্ম প্রধান হলেও শিবায়ন কাব্যে কিন্তু শৈবধর্ম প্রচারের চেষ্টা নেই। বরঞ্চ শিবায়ন কাব্যের যুগ শৈবধর্মের পতনকাল বা ভগ্নতার যুগ। শৈবধর্মের উপরে শাক্তধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। রামকৃষ্ণ রায় তাঁর শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক শিব-কাহিনী সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে বৈদিক হিন্দুধর্ম ও আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে ঐ জাতীয় প্রবণতা নেই। বস্তুত রামেশ্বর নিজে শৈব বা শাক্ত নন, তাঁকে বৈষ্ণব বলেই মনে হয়। শিবের প্রতি তাঁর ভক্তির কোন প্রকাশ নেই, আসলে কাব্যে তাঁর বিশিষ্ট ধর্মমতের পরিচয় নেই। তিনি যেমন শিবঠাকুরকে স্মরণ করেছেন আবার বৈষ্ণবধর্মের কথাও বলেছেন। তিনি গণপতি, শিব বন্দনার পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা ও সর্বদেব দেবীর বন্দনা করেছেন। বাঙালীর ধর্মগত প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা খুব শক্ত, আসলে বাঙালী পঞ্চোপাসক বলেই ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোন বিশিষ্ট চিন্তা নেই। রামেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পর্কেও বোধহয় একথা বলা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মমোহ ছিল জ্বরের মত। তবে

একালে শৈবধর্ম ছাপিয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য সূচিত হয়েছিল। রামেশ্বরের কাব্যে 'মহেশ্বর জ্বর' ও 'বৈষ্ণব জ্বরের' যুদ্ধে বৈষ্ণব জ্বরের প্রতিষ্ঠা একথা প্রমাণ করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য এক সমন্বয় যুগের মানুষ, তাঁর কাব্যে ধর্ম সমন্বয়ের সুউচ্চ আদর্শ প্রকাশিত। শিবায়ন ছাড়াও কবি 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন এবং সত্যপীরের পাঁচালীতে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম সম্মিলনের কথা আছে। কবি মুসলমান ফকিরের দেহে বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করেন। কবি লিখেছেন—

"রাম রহিম দোয় নাম ধরে একনাথ।"

কিংবা, "মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।"[১৪]

মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মকলহের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা সমন্বয়ের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। রামেশ্বরের কাব্যে সকল দেবতার প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখা যায়। গণেশ, শিব, চৈতন্যদেব এবং অন্য দেবতার প্রতি কবির একই মনোভাব। বরঞ্চ কোন দেবতাকে অবহেলা করে অন্য দেবতার পূজা করলে ধর্মাচরণ সার্থক হয় না— এই মনোভাবই কবির কাব্যে পরিস্ফুট। শিবমহিমা কীর্তন করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"অন্য দেবের দেব শিব জানে নাই যারা।
পণ্ডিতের পাশে কভু বৈসে নাই তারা॥
... ...
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।
গঙ্গাধরে ঘৃণা করে গুরুদ্রোহী জীব॥" (রামেশ্বর/৬৮)

রামেশ্বর তাঁর কাব্যে সর্ব দেবদেবী বন্দনার পাশাপাশি গন্ধর্ব, দৈত্য-দানো, ডাকিনী, যোগিনী সকলেরই বন্দনা করেছেন, সকলের প্রতি কবির সমান শ্রদ্ধা। ধর্ম সম্পর্কে কবির কোন অভিব্যক্তি নেই। বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবকে কবি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি কাব্যে বার বার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"তোমার মহিমা হর মনোবাক্য অগোচর
হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে।" (ঐ/৯)

রামেশ্বর হরিনামের মহিমা ঘোষণা করে লিখেছেন—

"আর কিছু কৃষ্ণকথা কহ কৃপাময়।
অমৃতের আস্বাদনে অরুচি না হয়॥
.....
কোন কার্য্যে কোন কথা কহিবার বেলা।
বিষ্ণুনাম নিতে কেহ কর্য্য নাই হেলা॥" (ঐ/১২৮-১২৯)

আবার শিবনাম ও রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে ভোলেননি—

"তার মধ্যে রামনাম সকলের সার
রামনাম পরে পর-ব্রহ্ম নাহি আর॥ (ঐ/১৩৭)

কবি নিজেকে বৈষ্ণব বলে দাবী করেছেন—

"হরিনাম শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের পর
বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর॥ (ঐ/১২৮)

রামেশ্বরকে বৈষ্ণব বলা যায়, কিন্তু কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের দ্বারা তিনি পরিচালিত হননি। সমন্বয় যুগের মানুষ বলে সকল ধর্মের মহিমা কীর্তন করেছেন তিনি। সমকালীন সমাজে প্রচলিত শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি নানা

ধরনের বার-ব্রত পালিত হত। শাস্ত্রীয় ব্রত, লৌকিক ব্রত দু'প্রকার ধর্মাচরণের কথাই কবি বলেছেন। সমাজে এ সমস্ত বার-ব্রত বিশেষ ধর্মকর্মের অঙ্গ ছিল। পার্বতী শিবঠাকুরকে ফসল ঘরে তোলার ব্রত বা পৌষলক্ষ্মীর ব্রত করতে বলেছে—

"পৌষ মাস পায়্যা পরে পার্ব্বতী কহেন হরে।
পৌষী-কৃত্য কর পশুপতি।" (ঐ/৩৪৫)

এছাড়া মনসা, ষষ্ঠী অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর ব্রত, পূজাপাঠ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মঙ্গলগান গাওয়া লৌকিক ধর্মাচরণের অঙ্গ ছিল।

শিবায়নে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মত বাঙালীর লৌকিক জীবন, লৌকিক ইতিহাসের বিচিত্র প্রবণতার কথা আছে। বাঙালী সমাজে সন্তানের নামকরণ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যে। সাধারণত সন্তানের নামকরণ করা হত ঠাকুর দেবতার নামে; এর মধ্যে দিয়ে ধর্মভীরু, দৈববাদী বাঙালীর বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর বিবাহে মেনকার জলসওয়া নামক অনুষ্ঠানে সমাগত এয়োদের নাম আছে। যেমন—

অরুন্ধতী লোপামুদ্রা সুমিত্রা সুভদ্রা ভদ্রা
সাবিত্রী সারদা সরস্বতী।
... ...
জীবনী যৌবনী জিতা জয়ন্তী অপরাজিতা
আশা প্রেমবতী পুণ্যবতী॥" (রামকৃষ্ণ/১২৮-১২৯)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যের 'এয়োদের নাম' অংশে ঐরূপ নামকরণ আছে—

"ভদ্রকালী ভবানী ভৈরবী ভগবতী।
ভানুমতি ভাগ্যবতী ভাগিরথী রতি॥
.....
কুঞ্জলতা ললিতা লক্ষ্মীর অবতার।
এয়োর প্রধান এয়ো কত শত আয়।" (রামেশ্বর/৭৮-৭৯)

এই নামকরণগুলিতে বেশীর ভাগ বৈষ্ণবীয় বিভিন্ন দেবদেবী ও তাদের নামের প্রতিশব্দে কিংবা চণ্ডী, মনসা অন্যান্য দেবদেবীর নামের প্রতিশব্দে নামকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আস্থা, তাদের বিচিত্র মানসিক ক্রিয়া ও মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কোথাও, বিশেষত রামেশ্বরের কাব্যে লৌকিক শব্দবন্ধে বা সাধারণ নামকরণও দেখা যায়, যেমন— পদী, খুদি, সোনা, রূপা, সোহাগী, সম্পদী, মণি, চাঁপা, ভগী, মাধুনী, মল্লিকা, সুশীলা ইত্যাদি। এর মধ্যে দিয়ে লোকায়ত জীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশিত। বাঙালী সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মুখে কিংবা স্ত্রীলোকের উচ্চারণে নামগত বিকৃতি লক্ষ করা যায়, তাইতো পদ্মাবতী হয় 'পদী', ভাগিরথী হয় 'ভগী'। যেমন—

"হৈমবতী বলে হ্যাদে নারাণ্যার মা।
নারাণ্যা ব্যাটার বিভা কোথা দিলা বা॥" (রামেশ্বর/৫০)

নারায়ণ এখানে 'নারাণ্যা'তে পরিণত হয়েছে। রামেশ্বর মধ্যযুগীয় বাঙালীর উচ্চারণ প্রবণতাটিকেও তুলে ধরেছেন।

তথ্যপঞ্জী

১। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৩৮।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮৩।

৩। ঐ, পৃঃ ১৮৯।

৪। 'ছেলে ভুলানো ছড়া', লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ, পৃঃ ১৫১।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮৫।

৬। ঐ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

৭। 'গ্রাম্যসাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড পঃ বঃ সংস্করণ, পৃঃ ২০৩।

৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২১২।

৯। ঐ।

১০। শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, 'রামেশ্বরের জীবনী' ভূমিকা অংশ।

১১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২৫-২২৬।

১২। শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২০।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৪৭।